প্রকাশিত হয় প্রতি মাসের ১ তারিখ

সময় পরিবর্তন

নভেম্বর ২০২৬ ● কুড়ি টাকা



ইডেনে রাজ্য সরকারের ‘মেগা শো’র দায়িত্বে ছিল গুজরাটের সংস্থা





জ্ঞানেশ কুমার অপসারণে সফল হবেন বিরোধীরা?

চোরবাগানে ভিড় সামলানোর ‘বিজ্ঞান’ মানা হয়নি



হকার থেকে দেবরাজের উত্থান-পতনের নেপথ্য কাহিনি



মহিলা বার সিঙ্গারদের জীবনের অজানা দিক

PATAKA

A Complete Care

Multi-Speciality Hospital

That Brings You

The Best Healthcare Services

- Bloodless & Painless Laser Colorectal Surgery
- Free Cleft Lip/ Palate Surgery
- Economical Gynae & Ortho Packages
- Gastroenterological Solutions, Including Laparoscopic Hernia Surgery
- All Dental & Eye Solutions
- End-to-end Diabetic Solutions, Including Diabetic Foot Care

GD HOSPITAL & DIABETES INSTITUTE

CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Tea That Makes Every Moment Special



BODY LINE
Inspiring Fitness

শক্তির আরাধনা
সুস্থতার অঙ্গীকার

এই দুর্গাপুজোয় বডিলাইন-এর
সঙ্গে শুরু হোক সুস্থ জীবনের
নতুন অধ্যায়



30+
YEARS OF EXCELLENCE

10,000+
GYM INSTALLATIONS
ACROSS INDIA, NEPAL & BHUTAN

5 LAKH+
SATISFIED CUSTOMERS

For Online Purchase, Visit-
www.bodylinesports.co.in

EMI@0%
BAJAJ FINSERV
HDFC BANK
We understand your world

14 D, Ballygunge Circular Road I Ph: +91 33 4064 8222
PS ABACUS, New Town (Opp. Kia Showroom)
Ph: +91 33 4809 2831

For Inquiry, Call:
81003 70636 / 81006 90070

BODY LINE
Inspiring Fitness
An ISO 9001:2015 Certified company
E-mail: bodylinesports@gmail.com

For complete Gym & Clubhouse Set-up in Hotels, Clubs, Residential Complexes, Corporate Offices, call: 98360 62590

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

PSB APNA GHAR

PREMIUM

WHERE LUXURY MEETS AFFORDABILITY

Attractive ROI*

NIL
- PROCESSING FEE
- INSPECTION CHARGES
- PREPAYMENT CHARGES

100%* LOCKER RENT CONCESSION



*T&C apply.

Toll Free Number

1800 419 8300

Follow us @psbindofficial

সময় পরিবর্তন

নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ ২৩ | সংখ্যা ১১

১৯

উত্তর কলকাতার অতি পরিচিত কো-এড কলেজের সামনে মেয়েরা নেশা করছে

— অরিন্দম মিত্র



২৭



নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য-৭২

— অরূপ বসু

৩১



দূরপাল্লার বাসে, ট্রেনে সিসিটিভি লাগানো জরুরি হয়ে পড়েছে

— তপতী মজুমদার

৪ সম্পাদকীয়

৫ পাঠকের মতামত

৭ ইডেনে রাজ্য সরকারের 'মেগা শো'র দায়িত্বে ছিল গুজরাটের সংস্থা — রবীন্দ্রনাথ চৌধুরি

৯ চোরবাগানে ভিড় সামলানোর 'বিজ্ঞান' মানা হয়নি — জয় চৌধুরি

১১ জ্ঞানেশ কুমার অপসারণে সফল হবেন বিরোধীরা? — সুপ্রিয় চৌধুরি

১৩ হকার থেকে দেবরাজ চক্রবর্তীর উত্থান ও পতনের নেপথ্য কাহিনি — শোভনলাল রাহা

১৫ অধিকাংশ মহিলা বার সিঙ্গার একই সঙ্গে অনেকের রক্ষিতা সোনাগাছির প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল চিমাদের — দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

২১ ঝাড়গ্রামে দীর্ঘ দিনের বে-আইনি কারখানাটি পালাবদলের পরেও রমরমিয়ে চলছে — জয়নাথ রায়

৩২ আলিয়া ভাটের মতো অনেকেই এই মানসিক রোগের শিকার হতে পারেন, কিন্তু কেন? — ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

৩৩ পথে-পথে পথের সুরে — অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

৩৫ নানা পাটেকর — সংগ্রাম থেকে কিংবদন্তি অভিনয় যখন জীবনের ভাষা হয়ে উঠেছিল — উজ্জ্বল নন্দী

৩৮ বাংলার রেখা — উজ্জ্বল নন্দী

৪০ নক্ষত্র পতন — দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

৪১ তৃণমূল ছাড়ায় দেবের জনপ্রিয়তা কমেছে — রিমা গঙ্গোপাধ্যায়

৪১ বিজেপির সিদ্ধান্তে সমস্যায় সঙ্গীতশিল্পী ও কলাকুশলীরা — দেবশ্রী মিত্র

৪২ বিবিধ

৪৩ আইএসএলের বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম করতে পারেনি — রবীন্দ্রনাথ চৌধুরি

৪৪ আইএফএ শিল্ডে কেলেঙ্কারি — জয় চৌধুরি

৪৫ কলকাতা ময়দানে একটি বৃহত্তর 'সমঝোতার খেলা' হতে চলেছে! — জয় চৌধুরি

৪৬ আইএফএ-তে জাতীয় ক্রীড়ানীতি লাগু ঘোষিত নির্বাচনের দিন — জয় চৌধুরি

সম্পাদক ঃ **দেবাশিস দত্ত**

সম্পাদকীয় ও বিজ্ঞাপন দপ্তর ঃ ৩, জগবন্ধু মোদক রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৫ (শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে)
টেলি ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৩৫৪ ৩৭৩৫
ই-মেল ঃ **editorsamayparibartan@gmail.com**
samayparibartan@yahoo.co.in
ওয়েবসাইট ঃ **www.samayparibartan.com**

'সময় পরিবর্তন'-এর পরিবেশক ঃ
কে কে পুরী নিউজ ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড
৯ ডেকার্স লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯

দিল্লি ও ত্রিপুরার জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ টাকা।
স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক

অশোককুমার রায় কর্তৃক ২৯, বিডন রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক অ্যালবাট্রস গ্রাফিক সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৩১৭এ/৬, বি. বি. চ্যাটার্জী রোড, ফ্ল্যাট নং - ৩, ৪র্থ তল, কৃষ্ণ কুঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪২



সম্পাদকীয়

আসল লক্ষ্য

পশ্চিমবঙ্গবাসী বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল বিজেপিকে। সরকার পরিচালনায় গেরুয়া বাহিনীর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা থাকতেই পারে। ছ'মাসে তাদের কেমন পারফরম্যান্স বা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করল তা নিয়ে আমরা যেমন কলম ধরেছি, অন্য সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় অহরহ চর্চা চলছে। এ সবের বাইরে নজরে আসছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ কয়েকজন মন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতির দম্ভ। এঁদের 'বাণী' সর্বদা আমরা শুনে থাকি, যাতে 'কমন' অহঙ্কার। আমরা বিশ্বখ্যাত বহু ভারতীয়কে দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ করেছি, কারোর কথাবর্তায় কখনও কি অহঙ্কারের লেশমাত্র দেখেছি? আমরা জানি, অহঙ্কার পতন ডেকে আনে। আমি আশঙ্কা করছিলাম শুভেন্দু অধিকারী সরকার যে কোনও সময় বড় সমস্যায় পড়বে। সেটাই ঘটল তাদের আমলের প্রথম দুর্গাপুজোয়। পশ্চিমবঙ্গের ৪১৬ বছরের দুর্গাপুজোর ইতিহাসে (প্রথম দুর্গাপুজো সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে ১৬১০ সালে) চোরবাগান পুজো মন্ডপে এই প্রথম পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং একাধিক আহতের নজিরবিহীন ঘটনা। প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় এমন হৃদয় বিদারক-কাণ্ডে পুজোয় ভাটা পড়ে। বিজেপি সরকারের সময় রাজ্যে প্রথম দুর্গাপুজো নিয়ে নানা বিরূপ কথার সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনার কোনও অভাব ছিল না। ঠিক যেমন পুজো কমিটিগুলির। তবে পুজোর আগে প্রশাসনের গা-ছাড়া ভাব দেখা গেলেও দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী সহ পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। এই ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, এমনকি ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালে। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য সিট গঠন। সর্বোপরি মৃতদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং পরিবারের একজনকে চাকরির ব্যবস্থার ঘোষণাই শুধু করেননি তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেছেন, আমি হ্যাপি মৃতদের পরিবার আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। আর একবার বলেন, ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আগের সরকার দেয়নি। আমার প্রশ্ন, প্রায় প্রতিক্ষেত্রে পূর্বতন সরকার ও নেত্রীর সঙ্গে তুলনার কি প্রয়োজন আছে? তৃণমূলের থেকে বিজেপি অনেক ভাল কাজ করবে বলেই তো তাদের জেতানো হয়েছে।



পুজোর আবহে আরেকটি বিতর্কিত ঘটনা বামেদের বই বিক্রয় কেন্দ্রে ভাঙচুর। ব্যাপারটি নিয়ে বেশ চর্চা হল। প্রতিবাদ শোনা গেল বিভিন্ন মহল থেকে। খোদ বিজেপির মন্ত্রী এবং আরএসএস নেতার মুখেও। দিলীপ ঘোষ, শমীক ভট্টাচার্য যথারীতি এই জঘন্য কাজের সঙ্গে বিজেপির যোগ অস্বীকার করেন। শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু স্পষ্ট বললেন, যারা ধর্ম মানে না, পুজো মানে না, তাদের পুজোর সময় বই বিক্রি না করাই ভাল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যে সব দল থাকবে শুধু তৃণমূল থাকবে না, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব। কিন্তু তৃণমূলের অবর্তমানে সিপিএম উঠে আসায় এখন তারাও আক্রমণের মুখে। তবে সিপিএমের বই বিক্রয় কেন্দ্রে ভাঙচুরে প্রচারের সঙ্গে বিক্রিও বৃদ্ধি পায়।

রাজ্যে যা কিছু হচ্ছে সে সবে কি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদন আছে? বলা হচ্ছে দিল্লির অনুমতি না থাকলে রাজ্য নেতাদের এক পা চলার ক্ষমতা নেই। তাহলে শুভেন্দু অধিকারী সেই সম্মতি পেয়েই যা ভাল বুঝছেন করছেন? তিনি কিছু না বলেও তৃণমূল ও মমতাকে শেষ করতে পারতেন। সম্প্রতি যেমন হঠাৎ বলেন ফ্লোর টেস্ট হলে বিজেপির ২০৯ ছাড়া (ইঙ্গিতে) ঋতব্রতপন্থীদের ৬৪ জন তাঁকে সমর্থন জানাবে। আসলে তিনি জেনে গেছেন দেশে কোনও পক্ষেরই বিজেপির বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আর গদি মিডিয়া বিজেপির বিরুদ্ধে লিখবে না। তাহলে আর চিন্তা কি? এখানেই শেষ নয়। উপ-নির্বাচনের পর আসন্ন পুর ভোটে বিজেপির জয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। শুভেন্দুর আসল লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচন। অনেক আগে থেকেই রটনা শুরু হয়েছে ২০২৯-এ বিজেপি হারছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-কাণ্ড এবং তাঁর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু হওয়ায় বিজেপির পরাজয়ের স্লোগান ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। যদিও অমিত শাহ বিজেপি আরও ৩০ বছর ক্ষমতায় থাকবে দাবি করেছেন। এ রকম চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে শুভেন্দু চাইছেন বিরোধীশূন্য রাজ্যে লোকসভার ৪২ আসনের ৪২টিতেই জয়, যা বিজেপির খুবই কাজে দেবে। সেই জন্যই তিনি পেয়েছেন ফ্রি-হ্যান্ড। সুতরাং রাজ্য বিজেপি যেমন চলছে তেমনই চলবে। ■

শুভেচ্ছা

'সময় পরিবর্তন'-এর পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।



সোশ্যাল মিডিয়ায় চরম মোদি-নিন্দা

বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেই তাদের ওপর ডিম থেরাপি প্রয়োগ হচ্ছে। কখনও তার থেকেও বেশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কুণাল ঘোষ, মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায় — সম্প্রতি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে এর থেকে অনেক বেশি কু-কথা ধারাবাহিকভাবে বললেও তাঁদের কিছু বলা হচ্ছে না। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বলা কথাগুলি আমাদের জানা। যেমন নারদা-কাণ্ডে টাকা নেওয়া, তৃণমূলে থাকাকালীন মোদি ও বিজেপির ব্যাপক সমালোচনা বা গরুর মাংস খাওয়া। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর নানা মন্তব্যের প্রতিবাদ। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সবথেকে নোংরা কথা বলেছেন বর্তমানে ঋতব্রতপন্থী প্রাক্তন পুলিশ অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন শুভেন্দুর শারিরীক ওরিয়েন্টশনে সমস্যা আছে। বালুরঘাটে তাঁর চারটে বয়ফ্রেন্ড আছে। তাঁর পিএরা শুভেন্দুর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এর থেকেও ব্যাপক আক্রমণ করা চলছে। কিছুই বলা বাকি থাকছে না। নালায়েক, অশিক্ষিত থেকে মহিলা-প্রীতি, ট্রাম্পের গোলাম— আরও কত কী? রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা রাজনৈতিকভাবে মোদিকে আক্রমণ করেন। সুব্রমণিয়াম স্বামী প্রথম নরেন্দ্র মোদির দেশ, বিদেশে মহিলা-প্রীতি নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি বুঝিয়ে দেন, মহিলা সাংসদরা মোদিকে খুশি করতে পারলেই ভাল পদ পান। বলিউডের রাখি সাওয়ান্ত সবথেকে কু-কথা বলেছেন। রাখি বলেন, মোদিজি — কঙ্গনা, স্মৃতি ইরানির থেকে হাড্ডি ছাড়া কি পাবেন। তার থেকে অনেক বেশি আমি আপনাকে দেব। কি দেবেন প্রশ্ন করা হলে প্রেম-ভালবাসা বলে তিনি দু'হাতে লাভ-এর সিম্বল দেখিয়ে সেটি একটু সরু করেন — যা তাঁর গোপনাঙ্গের ইঙ্গিত — ভাবা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে, দাড়ি, গোঁফওয়ালা জনৈক পাকিস্তানী সর্বভারতীয় চ্যানেলের মহিলা সঞ্চালকদের মোদি সম্পর্কে কোনও তেলমারা কথা নিয়ে মজা করে যা তা বলছেন। যেমন মোদির দালাল, মুজরেওয়ালি, মোদিকে রাতে খুশি করে টাকা কামায়, ভারতবাসীকে বোকা বানাচ্ছে ইত্যাদি। এটা দিনের পর দিন চলছে। ওই পাকিস্তানী অর্ণব গোস্বামী সহ প্রাক্তন জেনারেল যাঁরাই মোদি-বন্দনা করেন তাঁদের একইভাবে ধুয়ে দিচ্ছেন। এভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি, মোদি সম্পর্কে সাংঘাতিক খারাপ কথা বলেও পার পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা সাধারণভাবে চিন্তাই করা যায় না।

সোমনাথ ভট্টাচার্য
কলকাতা-৭০০০০৬

রাজ্যের সেরা কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন শুভেন্দু অধিকারী

বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মনে হয়েছিল আগামী ১৫ বছর শুভেন্দু অধিকারী সহজেই মুখ্যমন্ত্রী থেকে যাবেন। কিন্তু অল্পদিনেই আমার সেই ভুল ভাঙে। একের পর এক এমন ঘটনা ঘটতে থাকল যে বুঝতে পারলাম সোজা পথে আগামী বিধানসভা নির্বাচন জেতা বিজেপির পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শুভেন্দুরা যাই করুন, নির্বাচন সর্বভারতীয় বিজেপির ব্যাপার। তারা কিছুতেই এই রাজ্যের ক্ষমতা হাতছাড়া করতে চাইবে না। সুতরাই আগামী নির্বাচনে আবার নানা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটবেই। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আসলে শুভেন্দু রাজ্যের সেরা কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে যা করে চলেছেন ভাবছেন কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রথমে তাঁর হুমকিসুলভ কথাবার্তা। এটা বাংলার মানুষ একেবারে মেনে নিতে পারছে না। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে দলের অন্য মন্ত্রী, বিধায়কদের ওপর। শুভেন্দুর দেখাদেখি শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল এমনকি শর্বরী মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ওই একইভাবে কথা বলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর চক্ষুশূল হয়েছেন। শুভেন্দু প্রকাশ্যে বলেছেন তৃণমূলকে নির্মূল করবেন। মমতাকে ঘর থেকে বের হতে দেবেন না। তা করতে গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যা করছেন তার জন্য ধিকৃত একশ্রেণির মানুষের কাছে। মমতার পাশে থাকলে সেই সব বিধায়ক, সাংসদ, নেতা, নেত্রীর কপালে কী জুটছে তা রাজ্যবাসী দেখছেন। বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের নিয়ে আসল খেলা যে শুভেন্দু অধিকারী খেলেছেন তাও ফাঁস হয়েছে। তৃণমূল পিছিয়ে পড়ায় উঠে এসেছে সিপিএম। শুভেন্দু তাদেরও টাইট দেওয়ার প্রকাশ্য হুমকি দেন। বর্তমানে সিপিএম বনাম শুভেন্দুর লড়াই রাজ্য-রাজনীতির বড় ঘটনা। তৃণমূলের পর তারাই এখন শুভেন্দুর টার্গেট। এছাড়াও বারুইপুরে কিশোরীর ধর্ষণ-খুন থেকে জেলে একের পর এক মৃত্যু সহ প্রচুর খুচরো ঘটনা ঘটে চলেছে যাতে শুভেন্দু অধিকারী সমালোচনার মধ্যে পড়ছেন। আর সব কিছুতেই তাঁর তৃণমূল বা মমতাকে দায়ী করা কতটা সমর্থনযোগ্য — তারও বিচার আগামী দিনে হবে। বিজেপি বিধায়ক জীতেন্দ্র তিওয়ারী তাঁর জনসভায় সতীর্থদের সতর্ক করলেও শুভেন্দু অধিকারীরা তাতে কর্ণপাত করেননি। তাঁরা এতটাই তাঁদের কাজে মত্ত যে দেওয়াল লিখন পড়তেই চাইছেন না। অথচ অন্নপূর্ণা যোজনা, মিড ডে মিল, মা ক্যান্টিন, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদির অভিযোগ নিয়ে কোনও মাথাব্যাথা নেই। শতরূপ ঘোষরা — শুভেন্দুদের কপালে আগামী দিনে যে অশেষ দুঃখ আছে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

শমীক ঘোষ

ডবল ইঞ্জিন সরকারের আসল অর্থ প্রত্যক্ষ করছি

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন থেকে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার' কথাটি শুনে আসছি। বলা হয়েছিল কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ২০১৪ থেকে ক্ষমতায়। এবার রাজ্যে তারা জিতলে উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৬ ও ২০২১-এ সফল না হলেও ২০২৬-এ বিজেপির লক্ষ্য পূরণ হয়। আমরা সাধারণ মানুষ অপেক্ষায় ছিলাম এবার ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পাবে রাজ্য। গৌতম আদানির মতো দেশের সবথেকে বড় শিল্পপতি কলকাতায় এসে প্রচুর বিনিয়োগের স্বপ্ন দেখালেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির অন্য মন্ত্রী, বিধায়করা মাঝে-মাঝেই হুঙ্কার দিচ্ছেন এবার রাজ্য উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যেতে চলেছে। কিন্তু অচিরেই ডবল ইঞ্জিন সরকার কথাটির আসল অর্থ বোধগম্য হল। বিধানসভার স্পিকার, হাইকোর্ট, নির্বাচন কমিশন, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট সব বিজেপির পকেটে চলে গেল। যা খুশি তাই করলেও বলার কেউ নেই। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ভেবে দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তৃণমূল হেরেছে, হারতেই পারে — যে ভাবে নির্বাচন হয়েছে তাতে জেতা সম্ভব ছিল না। তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৬৫-৬৭ জনকে আর ২০ জন লোকসভা এবং চার জন রাজ্যসভার সাংসদকে তৃণমূলের পাশ থেকে কৌশলে সরিয়ে দেওয়া হল তা কি সংবিধানসিদ্ধ? এরমধ্যে ২০ জন সাংসদকে অনামি এনসিপিআই দলে যোগদান করিয়ে যে নাটক এখনও চলছে সেটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্ট হলে কি সম্ভব হতো? তৃণমূল থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিধায়কদের মধ্যে থেকে একজনকে বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা নির্বাচন কি সম্ভব ছিল? বিশেষজ্ঞরা রায় দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি কিন্তু রুখবে কে? সবই বিজেপির কথায় চলে। মমতার সঙ্গে থাকা বিধায়ক-সাংসদরা রাস্তাঘাটে বিপদের মুখোমুখি হলেও বহাল তবিয়তে আছেন যাঁরা তাঁর পাশ থেকে সরে গেছেন। এ সব ডবল ইঞ্জিন সরকারের জন্যই সম্ভব হচ্ছে। সেটা যেকোনও রাজনৈতিক সচেতন মানুষই বুঝতে পারছেন। আবার তৃণমূলের প্রতীক এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে যা ঘটে চলেছে সেটাও কি রাজ্য ও দিল্লিতে ভিন্ন-ভিন্ন সরকার থাকলে হতে পারত? নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর — সে দিনই নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের নাম ও প্রতীক কেড়ে নিয়ে অন্য নাম ও প্রতীক দিল। একেবারে সিনেমার মতো ব্যাপার। আমরা জানতাম বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে উপ-নির্বাচন আর পুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যা আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে মিটে যাবে। সুপ্রিম কোর্ট — নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে প্রতীক নিয়ে ফয়সালা জানুয়ারি ২৭-এর মধ্যে মিটিয়ে ফেলার। ফলে দুটি নির্বাচনেই তৃণমূলকে তাদের নাম ও প্রতীক ছাড়া লড়তে হবে। এখানেই শেষ নয়, আইএসএফ-এর এত দিনকার প্রতীক খাম দিয়ে দেওয়া হল ঋতব্রতদের, যাতে একদল ভুল করে খাম চিহ্নে ভোট দেন। এসবই হতে পারছে বিজেপির কেন্দ্র-রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদেই। এটাই হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন সরকারের আসল ফায়দা। জানি না, আগামী দিনে আরও কত কি দেখতে হবে?

শ্যামল চক্রবর্তী
কলকাতা-৭০০০০৬

জ্ঞানগর্ভ শমীক ভট্টাচার্যকে একটি প্রশ্ন

বিজেপির যাবতীয় মন্ত্রী, বিধায়ক নেতাদের থেকে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সত্যি আলাদা। সেটা তাঁর কথাবার্তার মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রমাণ হয়। শমীর ভট্টাচার্য ভাল বক্তা। গুছিয়ে কথা বলেন। শিক্ষার ছোঁয়া থাকে। পড়াশোনা আছে। তবে এখন অনেক বেশি কথা বলায় মাঝেমধ্যে ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলে বসেন, রাজ্যে এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সরকার চলছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লিগের নেতা ছিলেন। তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গে এখন মুসলিম লিগ সরকার? শমীক ভট্টাচার্য জ্ঞান ফলাতে গিয়ে নেতাজির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করে বসেন। বিজেপিতে এটা অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। সাধারণ মানুষের তরফে সমালোচনার ঝড় উঠলে তিনি কথা ঘুরিয়ে দেন। শমীকের একটি মুদ্রাদোষ আছে, অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেই তিনি অবধারিতভাবে বলছেন তার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এর প্রেক্ষিতে বলেছেন, একদিন বিজেপি বলবে শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। শমীকবাবুর আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি বিজেপিকে আকাশে তুলে মমতা সহ তৃণমূলকে কোনও রাজনৈতিক দল বলে মানতেই চান না। কিন্তু শিক্ষিত শমীক ভট্টাচার্য কি করে ভাবলেন তাঁরা কৌশল করে মমতার পাশ থেকে বিধায়ক, সাংসদদের সরিয়ে বলবেন তৃণমূল নেত্রীর পাশে এখন কেউ নেই — তা মানুষ মেনে নেবেন। আসল ঘটনা তাঁরা যেন বুঝতে পারছেন না। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এরপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ভাল সংখ্যায় কিন্তু সমর্থক রয়ে গেছেন। এর কারণ শমীকবাবু বলতে পারেননি। আসলে তৃণমূল বিধায়ক-সাংসদদের সরিয়ে দিয়ে তাঁরা ভেবেছিলেন তাতেই তাঁর পাশ থেকে সমর্থকরাও সরে যাবেন। তিনি এখনকার মন্ত্রী, বিধায়কদের মতোই ভেবেছিলেন তৃণমূল সমর্থকদের। শমীক ভট্টাচার্যের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, তিনি খুব বড় মুখ করে বিজেপির আদর্শর বড়াই করেন। আমার প্রশ্ন, তিনি দয়া করে জানাবেন, বিজেপির আদর্শটা ঠিক কি? ১৯৮০ সালে দলটির জন্ম আমাদের চোখের সামনেই। অটলবিহারী বাজপেয়ী, আদবাণীর মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল। আর এখন যেকোনও ভাবে রাজ্য জয় করাই বিজেপির লক্ষ্য। তার জন্যই যত রকমভাবে নির্বাচনে দুর্নীতি করা। এবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটে বিজেপি যা করেছে তারপরও শমীকবাবুদের গর্ব দেখে এটা বোঝা যায় একশ্রেণি মানুষের মধ্যে থেকে লজ্জা ব্যাপারটা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। রাজনীতি করতে গেলে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করতে হয়। বিজেপি সেই প্রবাদকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে।

সুজাতা মল্লিক
কলকাতা-৭০০০০৮

জানি না কোন উচ্চমানের আইনের শাসন চলছে?

ভারতের গণতন্ত্র, সংবিধান নাকি বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, এটাই বহুল প্রচারিত। কিন্তু অনেক শ্রেষ্ঠ জিনিসও যে কুৎসিত হয়ে যেতে পারে অপাত্রে ব্যবহারের ফলে, তা আমরা দৈনন্দিন জীবনে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। বাংলায় দুটি উপ-নির্বাচন হল। কয়েক মাস আগে যে দল শাসকের ভূমিকায় ছিল, তারা পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সেই দলকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া বা সেই দলের প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়া, এটা কোন সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপ-নির্বাচনে ঘাসফুলের ওপর জোড়া ফুল বলে কোনও সিম্বলই রইল না! আর এমনি শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, মমতা নন্দীগ্রামে যাঁকে প্রার্থী করেছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের পর প্রার্থীপদ তুলে নিলেন! জানি না, এটা ভয় আউট ভরসা ইন-এর সুস্থ নিদর্শন কিনা? তৃণমূলের যখন কোনও প্রার্থী থাকল না, তখন মমতা কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করার ঘন্টা খানের মধ্যেই কুড়ি বছরের পুরনো কেস জিইয়ে তুলে কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সরকারি মদতে! জানি না, কোন উচ্চমানের আইনের শাসন চলছে দেশে? যে সরকার বিরোধীপক্ষকে মাঠের বাইরে রেখে ভোটে অবতীর্ণ হয়, তারা কোন সংবিধান মেনে দেশ, রাজ্য চালাচ্ছে, ভেবেই আতঙ্কিত হচ্ছি! অন্যদিকে, তৃণমূলের টিকিটে জেতা দলত্যাগী কুড়িজন সাংসদের সাংসদ পদ থাকবে কি থাকবে না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে স্পিকার দিনের পর দিন নষ্ট করে চলেছেন! একের পর এক ডেট দিয়ে স্পিকার ওই কুড়িজন সাংসদকে অক্সিজেন দিয়েই চলেছেন! তিনি যা করছেন, তা কি সংবিধান মেনে নাকি সংবিধানের অপব্যবহার করে? ভারতের সংবিধানকে কালিমালিপ্ত করার এমন অপপ্রয়াস মনে হয় পূর্ববর্তী সরকার কোনও দিনও করেনি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র কি রাজ্য, দুটি সরকারই বাংলার গণতন্ত্রের সলিল সমাধি রচনা করছে। তবুও মানুষ চুপ! ট্যা ফুঁ করলেই তো হয় জেলে না হয় দেশদ্রোহী তকমা! বিশেষ করে বাঙালি কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে। মমতার শাসনে সরকারি ভবনের করিডোরে কত স্লোগান ধ্বনিত হতো অহরহ! মমতার পদত্যাগ চেয়ে বা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে! উত্তাপ আছে, চার দেওয়ালের মাঝখানে, সেই উত্তাপ যেন বাইরে না যায়, গেলেই নাকি বিপদ! মমতার 'লদী ভান্ডার' কত সুন্দর ভাবে কার্যকরী হয়েছিল, কোথাও কোনও সমস্যা ছিল না, কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রচলিত 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার'-এর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ছে! হানিমুন পিরিয়ডের মধ্যেই যে ভাবে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বিরুদ্ধে চাপাআগুন ধিকিধিকি জ্বলছে, কিন্তু উদ্গীরণ হচ্ছে না, সেটা বিস্ময়করই বটে! তবে ভরসার কথা একটাই, ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয়। অপাত্রে পড়ে যতই তার অপব্যবহার হোক না কেন, দেশবাসী যখন রুখে দাঁড়াবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর, তখন আগ্নেয়গিরির মতো অগ্ন্যুৎপাত হবেই। সেই অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়ে যাবে অশুভ শক্তি — ইতিহাস এটাই বলে।

বিজন মজুমদার
ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর ভূমিকায় লজ্জিত হওয়া উচিৎ বাকি সংবাদ মাধ্যমের

'সময় পরিবর্তন'-এর 'পাঠকের মতামত' বিভাগে জনৈক পত্রলেখকের লেখা চিঠি থেকে জেনেছিলাম, আগে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে কত চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হতো। মোদির জমানায় সেসব বন্ধ। ওই চিঠির শেষে বলা হয়েছিল তেমন কোনও সংবাদ ফাঁস হলে জানা যাবে বিজেপির দুর্নীতির বহর কত বিরাট। দেখলাম সেই ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সঠিক ছিল। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের চূড়ান্ত অবৈধ কার্যকলাপ ফাঁস হতেই দেশ জুড়ে হইচই পড়ে গেছে। তাঁর তৈরি ভোটার তালিকার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনগুলি বাতিলের দাবি করা হয়েছে। পুনর্নির্বাচনের আবেদন জানানো হয়েছে। আমি মনে করি, এটা স্রেফ শুরুওয়াত। তৃণমূলের বিগত ১৫ বছরের দুর্নীতির থেকে মোদি সরকারের ১২ বছরের দুর্নীতি অনেক বেশি। ললিত মোদি, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি — যাঁরা বিপুল পরিমাণে ব্যাঙ্ক ঋণ না মিটিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন সেই সংবাদের নেপথ্য কাহিনি ফাঁস হলে আমি নিশ্চিত ফের একবার দেশ জুড়ে হইচই পড়ে যাবেই। এরপর বলতে হয়, গৌতম আদানির সঙ্গে মোদিজির বোঝাপড়ার আসল ব্যাপারটি। এই গোপন ডিল যদি প্রকাশ্যে আসে সেটাও জ্ঞানেশ কুমারের খবরের থেকে কম চাঞ্চল্যকর হবে না। এমনি আরও কত ঘটনা আছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিজেপির দুর্নীতি। দেশের মধ্যে একমাত্র 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' কোনও সরকারকে তোয়াক্কা করে না। তাই ওই রকম দুঃসাহসিক সংবাদ প্রকাশ পেল। পারলে তারাই পারবে আবার বোমা ফাটাতে। দেশের বাদবাকি বৃহৎ পত্রিকা হাউস সহ নিউজ চ্যানেলগুলির লজ্জিত হওয়া উচিৎ তাদের ভূমিকার জন্য। সকলেই নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে মোদি সরকারের কাছে। বাংলা সংবাদ মাধ্যমের কথা যত কম বলা যায় তত ভাল। একটা উদাহরণ — নন্দীগ্রামের উপ-নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহাস করে প্রার্থী হওয়ার কথা বলেন ঋতব্রতপন্থীরা। সংবাদ মাধ্যমে তা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু ২৮ আগস্ট তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জন্মদিনের মঞ্চে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় — শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, আপনি যদি সনাতনী হিন্দু ও এক বাপের ব্যাটা হন তাহলে ভবানীপুরে ভোটের দিন এবং ভোট গণনার সিসিটিভি ফুটেজ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দেখান। সেই সংবাদ কিন্তু প্রকাশ পায়নি। 'সময় পরিবর্তন' লিখেছিল এখন সংবাদ মাধ্যম থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী পোর্টালগুলি। যাঁরা দেখেন তাঁরাই সেটা স্বীকার করবেন। এবার এদের বন্ধ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। জানি না, এই প্রচেষ্টা শেষ অবধি কি হবে? পোর্টাল বন্ধের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা উচিৎ বলেই মনে করি, তবে নিয়ন্ত্রণ একটা অবশ্যই থাকা দরকার।

ঈশানী মিত্র
কলকাতা-৭০০০০৪

ইডেনে রাজ্য সরকারের ‘মেগা শো’র দায়িত্বে ছিল গুজরাটের সংস্থা



রবীন্দ্রনাথ চৌধুরি

দুর্গা কার্নিভাল না করে ময়দান চত্বরে সাজসজ্জা এবং মহালয়ার দিন ইডেনের অনুষ্ঠানে গুজরাটের সংস্থা লাভবান হল, কলকাতার এজেন্সিগুলো আঙুল চুষল। তৃণমূল সরকারের আমলে রেড রোডে কার্নিভাল হলে কলকাতার বিভিন্ন এজেন্সি কাজ করত। রাজ্য সরকারের ব্যয় করা অর্থ পশ্চিমবাংলাতেই থাকত। কিন্তু বিজেপি সরকার সেই কার্নিভাল বন্ধ করে দিয়েছে। মহালয়ায় ‘মেগা শো’ হয়েছে ইডেনে। সাধারণ মানুষ সেখানে যায়নি। যদিও শুভেন্দু অধিকারির জেলা থেকে প্রচুর লোককে আনা হয়েছিল সরকারি বাসে। রেড রোডে কার্নিভাল হলে পুজো কমিটিগুলো খরচা করত অনেকটাই। এবার পুজো কমিটিগুলোকে সেভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ইডেনের অনুষ্ঠানে। তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, লক্ষ্মীপুজোর ভাসানের দিন মিলনমেলা প্রাঙ্গনে ‘বিজয়া উৎসব’ নামে একটি অনুষ্ঠানে। এই সবই করল গুজরাটের একটি সংস্থা। খরচ হল ১৬৭ কোটি টাকা।

রাজা বদলায়, কাজের ধরন বদলায় না। কাছের লোককে কিছু পাইয়ে দেওয়ার ছক যেন এদেশের, এ রাজ্যের কর্মসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেকরেটর থেকে ক্যাটারার সবাই হাজির লাইনে। সরকারি অনুষ্ঠানে বছরের পর বছর ম্যারাপ বাঁধবে একই কোম্পানি, খাবার সাপ্লাই করবে একই লোক, সরকারি বিজ্ঞাপন তৈরি করবে একই এজেন্সি, ট্রেন-প্লেনের টিকিট কাটবে একই এজেন্ট — এটাই নিয়ম হয়ে গেছে। টেন্ডার বলে যে একটা বস্তু আছে, সরকারি কাজ পেতে গেলে যে একটা মান এবং মূল্যের প্রতিযোগিতার মধ্য



রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইডেনের অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী।



মহালয়ার দিন ইডেনে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠান।



সরকারি বিজ্ঞাপনে 'অভিনব' বাংলা।

দিয়ে যেতে হয়, সেটা বেমালুম ভুলে যান কর্তারা। যদিও বা টেন্ডার নিয়ে কথা ওঠে, একই সংস্থা বেনামে তিনটে আবেদন জমা দিয়ে আইন এড়ালে কেল্লাফতে।

তৃণমূল জমানায় এই স্বজনপোষণ চরমে পৌঁছেছিল। বিস্তারিত না বলে শুধু বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা ভাল কারণ এ মুহূর্তে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। মমতা সরকার কলকাতার একটি এজেন্সিকে দিয়ে সব প্রচারের কাজ করাত বলে অভিযোগ। জেনেসিস অ্যাডভারটাইজিং নামের সেই সংস্থা সংবাদপত্র থেকে অডিও ভিশ্যুয়াল মিডিয়ায় সরকারি বিজ্ঞাপন দেশে, বিদেশে সরকারি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট - বেশির ভাগটাই নিয়ন্ত্রণ করত। শুধু তাই নয়, তৃণমূল সুপ্রিমো আর তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মন্ত্রী-আমলাদের নির্দেশে বেসরকারি বহু সংস্থাও নিজেদের ইন হাউস অথবা দীর্ঘদিনের সহযোগী এজেন্সি থাকা সত্ত্বেও জেনেসিসকে দিয়ে বিজ্ঞাপন ডিজাইন বা রিলিজ করাতে বাধ্য হতো।



এই সেই ১১ হাতের দুর্গা।

রাজ্যে পালা বদলের পর আশা করা গিয়েছিল, এবার সরকারি প্রচারে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হবে। তা হল না, বদলে এই উৎসবের মরশুমে বাঙালি পেল, 'মায়ের করবো স্বচ্ছতা সে স্বাগত'। কলকাতা পুরসভার এই 'অভিনব' বাংলা বিজ্ঞাপনে প্রথমে চমকে উঠল বাঙালি, তারপর রাগে ফেটে পড়ল। স্বাভাবিক, বেসরকারি পণ্যের বিজ্ঞাপনে এ আই কৃত অস্বাভাবিক বাংলা দেখে হাসাহাসি, বড়জোর সমাজ মাধ্যমে প্রতিবাদী পোস্ট করা যায়। কিন্তু সরকারি পুজো সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে কেন মানুষ সহ্য করবেন ভাষা নিয়ে এই অনাচার? তুমুল সমালোচনার মুখে বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলাল বটে, কিন্তু খুবই আড়ষ্ট অনুবাদের বাংলা — 'স্বচ্ছতার সাথে মাকে স্বাগত জানাই'। অথচ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে নিশ্চয়ই এমন কিছু লোক কাজ করেন, যাঁরা অন্তত সঠিক বাংলা লিখতে পারেন। কেউ দেখল না বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে? যেমন কেউ দেখেনি যেদিন মা দুর্গার দশভুজা নামের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে কে বা কারা তাঁকে এগারো হাতে অবতীর্ণ করিয়েছিল সরকারি অনুষ্ঠানের পোস্টারে। সেবারও তুমুল সমালোচনার মুখে মিলনমেলা প্রাঙ্গণে শেষমেষ রং দিয়ে মোছা হয়েছিল বাড়তি হাতটি। তাতে অবশ্য প্রতিমার কোন হাতে কোন অস্ত্র ধরা থাকে, সেই নিয়মে গণ্ডগোল হয়ে যায়। সেটা বিশেষ পাত্তা দেননি আয়োজকরা। হাত কেলেঙ্কারিতে ক্ষমা চেয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

এই যে লাগাতার বিভ্রাট, সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেনে বহুল প্রচারিত উমা আগমনী মেগা ইভেন্ট। প্রথমে কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী আসবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব উদ্বোধনে। তারপর জানা গেল, নরেন্দ্র মোদি না এলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসবেন। সম্ভবত রাজধানীতে বিরোধীদের লাগাতার আন্দোলনে জেরবার মোদি-শাহ কলকাতায় এসে উৎসবে সামিল হওয়ার ঝুঁকি নিলেন না। তবু আগমনী হল জাঁকজমকের সঙ্গে। ড্রোন শো, বাজির ঝলকানি নজর কাড়ল, কিন্তু কারা সেই উদ্‌যাপনে সামিল হওয়ার ডাক পেয়েছিলেন, ঠিক বোঝা যায়নি। উন্মুক্ত যদি হয়ে থাকে মহালয়ার অনুষ্ঠান, তবে সাধারণের জন্য পাস কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করতে হতো, সঠিকভাবে জানা যায়নি। শোনা গেছে, মন্ত্রী, সান্ত্রী, বিধায়ক, আমলারা দেদার পাস পেয়েছেন, এমনকী ভিন্‌রাজ্য থেকেও লোক আনা হয়েছিল ইডেন ভরাতে। কিন্তু কলকাতার মানুষ টিভি আর রাস্তার মোড়ে বড় পর্দায় দেখেই আশা মিটিয়েছেন।

১৫০ কোটি, মতান্তরে ১৬৭ কোটি টাকার এই বিশাল সরকারি অনুষ্ঠানের কারিগর কে? দুঃখের বিষয়, এই বাংলার কোনও এজেন্সি নয়। আহমেদাবাদের অন্যতম শীর্ষ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি 'গো বানানাস' এই বরাত পায়। মালিকের নাম নীশীত শাহ। তারা আবার তিনটি এজেন্সিকে ভাড়া করেছিল এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সামাল দেওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য, সাব এজেন্সিগুলির একটিও বাংলার নয়। 'গো বানানাস' নাকি যথাযথ টেন্ডারের মাধ্যমে এই অর্ডার পেয়েছে বলে সরকারের তরফে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতার কোনও এজেন্সি এ ধরনের কোনও টেন্ডারে অংশ নিয়েছে বলে শোনা যায়নি। এ কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে আগমনী অনুষ্ঠান আয়োজনের দক্ষতা পূর্বাঞ্চলের কোনও কোম্পানির নেই। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের এই দুর্দিনে ১৬৭ কোটি টাকার ব্যবসা করে চলে গেল গুজরাটের একটি সংস্থায়, এটা রাজ্যবাসীর পক্ষে হজম করা কঠিন।

কলকাতায় পার্টনারশিপ সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেছেন, মহালয়ার মেগা ইভেন্ট করতে পশ্চিম ভারত থেকে লোক আনতে হল। আশা করি, এর থেকে কাজটা শিখে আগামী বছর বাংলার কোনও এজেন্সি পারবে।

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির সম্পর্কে সম্যক ধারনা নেই, এমন ভিন্ রাজ্যের এজেন্সি দিয়ে এ রাজ্যের সরকারি প্রচারের কাজ করানোর পিছনে কার বা কাদের স্বার্থ জড়িত, অবিলম্বে প্রতিবাদ না হলে সেই ভুলভ্রান্তি ও স্বজনপোষণের ট্র্যাডিশন সমানে চলবে। ■



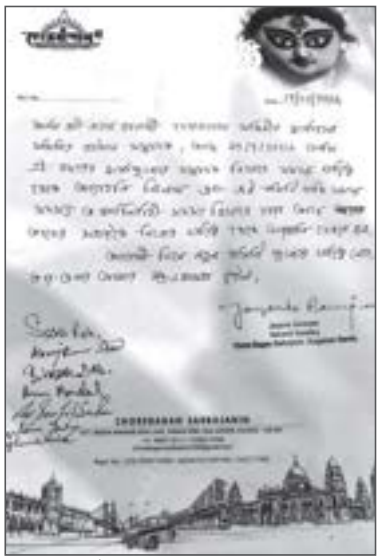
অনুষ্ঠানে পারফর্ম করছেন শিল্পীরা।



চোরবাগানে ভিড় সামলানোর ‘বিজ্ঞান’ মানা হয়নি

জয় চৌধুরি

২০২১-এ ব্যর্থ হওয়ার পর বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে ২০২৬-এ রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। এই দলটির হিন্দু ধর্মের প্রতি অধিকারবোধ প্রবল। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতি গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন গত ৪৯ বছরে এই রাজ্যে প্রকৃত দুর্গাপুজো হয়নি, এবার হবে। তারই জেরে ২০২৬-এর দুর্গাপুজো নিয়ে বিজেপির তরফে নানা নিয়ম-নীতি শোনা গেলেও শেষ অবধি কিছুই লাগু হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে যেমন দুর্গাপুজো হয়ে আসছে তেমনই হয়। এবারের নতুনত্ব দুর্গাপুজোয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ, এমনটা আগে কখনও দেখা যায়নি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি সম্বলিত বেশ কিছু পুজোমন্ডপ দেখা যায়। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মন্ডপে প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং একাধিকের আহত হওয়ার ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোর ইতিহাসে এমনটা আগে কখনও হয়নি, যা নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনার ঝড় শুরু হয়।



ক্লাবের পূর্বতন সচিবের পদত্যাগপত্র।

দুর্ঘটনাটি ঘটার পর থেকেই যাবতীয় মিডিয়াতে ‘পোস্টমর্টেম’ আরম্ভ হয়। বিষয় ঃ কেমন এমন নজিরবিহীন দুর্ঘটনা? ২৭ অক্টোবর এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও কোনও-কোনও সংবাদমাধ্যমে এখনও চলছে এর কারণ অনুসন্ধান। আশা করি উৎসাহী পাঠকরা সেইসব বিস্তারিতভাবে না পড়লেও নজরে রেখেছেন। এবং প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভাবনা তৈরি হয়েছে চোরবাগান-কাণ্ড নিয়ে। ১৭ অক্টোবর ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নিয়ে আমাদের এই সংক্রান্ত অন্তর্তদন্ত প্রকাশিত হবে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, চোরবাগান নিয়ে দিনের পর দিন বহু লেখালিখির পরেও সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি তুলে ধরা হল।

এবার চোরবাগানে যা হল সেটা ভিড় সামলানোর সায়েন্স না জানার মাশুল। ভিড়েরও বিজ্ঞান আছে। তবে সবার ওপরে আছে মা দুর্গার অভিশাপ। প্রদীপ দে, জয়ন্ত ব্যানার্জির মতো চোরবাগানের পুজো পাগল মানুষরা অনেক চেষ্টা করে ভিডিওতে পুজো ঘিরে সেই অনিয়মগুলি (প্রতিমার দিক পরিবর্তন, প্রতিমাতে ত্রুটি) এনেছিলেন। তাঁদের গায়ের জোরে কমিটি থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। জয়ন্ত ব্যানার্জিকে দিয়ে



দুর্ঘটনাস্থলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

লেখানো বলপূর্বক চিঠি এই প্রতিবেদনের সঙ্গে আছে।

গত ১৭ জুলাই রথের দিন তাঁরা যথারীতি খুঁটিপুজো করেছিলেন। এই কমিটি সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। খুঁটিপুজোতে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিজেপি নেত্রী এসেছিলেন। ভাবা হয়েছিল চোরবাগানে ডিস্টার্ব করবে না বিজেপি। কোথায় কি? উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে পুজো কমিটির দখল নিতে নেমে পড়লেন স্থানীয় বিধায়ক বিজয় ওঝা। ছুটে গেলেন শিশির অধিকারীর বড়খোকার পুত্র। প্রদীপ দে তথা বাপি সিএবির টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। একটা সময় অভিষেক ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই জন্য তিন বছর আগে হয়েছিলেন মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যান। জয়ন্ত ব্যানার্জির সঙ্গে তৃণমূলের সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও একটা সম্পর্ক ছিল। জয়ন্ত পরিবর্তনের পর সরাসরি সচিব হতে চাননি। তাঁর মেয়ে সচিব হয়েছিল। বিজেপিকে বার্তা দিতে নরেন্দ্র মোদির ছবি আছে তাঁদের অস্থায়ী অফিসে। ওই বাড়িটি নিয়ে বিতর্ক আছে কলকাতা পৌরসভার খাতায়।



চোরবাগান-কাণ্ডে তদন্তকারী টিম ঘটনাস্থলে।

এ সব পুজো শুরুর আগের ঘটনা। দুর্ঘটনা ঘটার পর আমরা দৃষ্টি দেব কি কারণে এমন ঘটনা ঘটে গেল?

আমরা ভাবি ভিড় মানে অনেক মানুষ। বিজ্ঞান বলে ভিড় মানে ঘনত্ব।

১. ফ্রুইন-এর লেভেল অফ সার্ভিস ঃ

জন এফ জে ফ্রুইন ১৯৭১ সালে দেখিয়েছিলেন প্রতি বর্গ মিটারে দু'জন থাকলে ভিড় স্বাভাবিক। চার জন/বর্গমিটার হলেই আপনি আর নিজের ইচ্ছায় হাঁটতে পারবেন না, ভিড় আপনাকে ঠেলবে। আর ৬-৭/বর্গমিটার হলেই দম বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়, কেউ কাউকে মারায় না, শুধু চাপে। চোরবাগানের ওই সরু গেটে বৃষ্টির সময় ঘনত্ব ৬ পার করে গিয়েছিল।

২. হেলবিং-এর প্যানিক মডেল ঃ

জার্মান বিজ্ঞানী ডার্ক হেলবিং 'নেচার' জার্নালে দেখিয়েছিলেন, ভিড় যখন আতঙ্কিত হয়, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, ফ্লুইড হয়ে যায়। আলো-আঁধারি থিম, উঁচু-নিচু সিঁড়ি এই জমাটকে আরও বিপদ ডেকে আনে।

৩. বৃষ্টি কেন বিপদ বাড়ায় ঃ

ভিড়ের বিজ্ঞানে একে বলে ''রিড্যুস্ট এগ্রেস ক্যাপাসিটি''। বৃষ্টি হলে সবাই একসঙ্গে শেডের নিচে, মন্ডপের ভিতরে ঢুকতে চায়। তখন কাউন্টার ফ্লো হয়। একদল ঢুকছে, একদল বেরোচ্ছে, মাঝখানে আটকে মৃত্যু। শারদোৎসবে বৃষ্টি আগেও হয়েছে। কিন্তু এবার মন্ডপের ডিজাইন আর কেন্দ্রীভূত কন্ট্রোলে কেউ ভিড়টা বের করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। উল্টে মন্ডপ ভেঙে পড়তে পারে ঘোষণাট হিতে বিপরীত হয়।

পদপিষ্ট আটকাতে তিনটে জিনিস লাগে, যেটা ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ)-এর গাইডলাইনে আছে ঃ

১. একমুখী চলাচল (প্রবেশ আলাদা, প্রস্থান আলাদা)

২. ভিড়ের ঘনত্ব মাপার জন্য সিসিটিভিতে ঘনত্বের অনুমান

৩. পর্যাপ্ত আলো, উঁচু-নিচু নয়, সমান মেঝে।

চোরবাগানে তিনটেই ছিল না। চোরবাগানে ক্রাউড ডায়ানামিক্স-এর বিজ্ঞান মানা হয়নি। ভিড়কে শুধু লাঠি দিয়ে সামলানো যায় না, ভিড়কে বুঝতে হয়। না হলে মায়ের সামনেই মৃত্যুমিছিল দেখতে হবে। তবে এমন ঘটনা আরও কিছু মন্ডপে হলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। অল্পের জন্য সব রক্ষা পেয়েছে।

ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট যে একটি বিজ্ঞান সেটা যেন মানুষ বুঝতে পারে সেই জন্য এইগুলি উল্লেখ করা হল। পুজোর প্যান্ডেলে নয়, এটা প্রযোজ্য ব্রিগেডের জনসভায়, যুবভারতীতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ এবং আইপিএল কিংবা ইন্ডিয়া টিমের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে।

চোরবাগান-কাণ্ড নিয়ে সিট তাঁদের তদন্তের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, চোরবাগান ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সিটের পরামর্শ মেনে আগামী বছরে দুর্গাপুজো হবে। দেখা যাক, কী সব নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেগুলি কতটা কার্যকর হয়? ■



নিঃশব্দে নিরঞ্জন করা হয় চোরবাগানের প্রতিমাকে।



জ্ঞানেশ কুমার অপসারণে সফল হবেন বিরোধীরা?

সুপ্রিয় চৌধুরি

নিট সহ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরিপ্রেক্ষিতে ককরোচ জনতা পার্টির জোরদার আন্দোলনে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এটি ছিল মোদি সরকারের প্রথম উল্লেখযোগ্য নতিস্বীকার। এর আগেও নরেন্দ্র মোদিরা আন্দোলনের জেরে পিছিয়ে এসেছেন, কিন্তু কোনও মন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার মতো বড় ঘটনা ঘটেনি। আমরা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন দেখেছি। বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর ছিল যে দেশজুড়ে জনসমর্থন ওই আন্দোলনের পিছনে ছিল, যার তীব্রতা অনুভব করেই নরেন্দ্র মোদিরা সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে।

এর কিছু দিনের মধ্যে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' দৈনিকে সার-কাণ্ডে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মারাত্মক কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়। যার মোদ্দা কথা, বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এককভাবে জ্ঞানেশ কুমার একের পর এক এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার প্রেক্ষিতে লক্ষ-লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যায়। সংবাদসূত্রে প্রকাশ পায় ১৪টি ক্ষেত্রে দুই নির্বাচন কমিশনার আপত্তি তুলেছিলেন জ্ঞানেশ কুমারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।

রাহুল গান্ধী অনেক দিন ধরেই নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ করছেন। সেই জন্য ফের ব্যালট পেপারে ভোটের দাবি জানিয়ে আসছেন। কংগ্রেস জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু করে। ককরোচ জনতা পার্টিও ফের একবার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে নামে। কংগ্রেস তাতে যোগ দেয়। সঙ্গে ইন্ডিয়া জোট। বেশ কিছু দিন ধরেই সেই আন্দোলন চলছে। মিডিয়াতে তা নিয়ে জোর চর্চা হচ্ছে। সমাজ মাধ্যমে ভোট চুরি নিয়ে মোদি-জ্ঞানেশ কুমারের একাধিক মিম দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের অনুমান নরেন্দ্র মোদিরা এবারে আর কিছুতেই জ্ঞানেশ কুমারকে সরাবেন না। কেন? সেই উত্তর নিশ্চয়ই দেব। তার আগে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক জ্ঞানেশ কুমার সার-এর নামে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বৈধ ভোটারদের নাম কীভাবে বাদ দিয়ে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। আপাতভাবে ভোটার লিস্টে জালিয়াতি রোখা উচিৎ বলেই মানুষ রায় দিয়েছিলেন, বিশেষ করে বিজেপিপন্থীরা। আমাদের প্রশ্ন ছিল, যদি সার করতেই হয় তা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে কেন শুরু করা হয়নি? এই ব্যাপারে বিজেপির ফায়দা থাকায় গদি মিডিয়া এবং মমতা-বিরোধীরা যুক্তি দেখালেন আগেরবার এই সময়েই সার সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাহলে এবার হবে না কেন? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ২৭ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য চূড়ান্ত না করেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন হল। তাতে কিছু হেলদোল হয়েছিল কী? এমনভাবে ভোট কি কখনও এদেশে হয়েছে? কিন্তু বলবে কে? রুখতে কে?

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর সংবাদে জানা যায়, কম করে আরও ১৬ লক্ষ ভোটার ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যদিও শুরুতে এই চিত্র আরও মারাত্মক ছিল।



তিন নির্বাচন কমিশনার।

সার শুরু হওয়ার আগে থেকেই রাজ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলে আসছিলেন পশ্চিমবঙ্গে এককোটির বেশি নাম বাদ যাবে। দেখা গেল বাদ পড়েছেন এক কোটি ২০ লক্ষ ভোটার। শুরুতেই বাদ হয়েছিল ৬৩ লক্ষ ভোটার, যারা মৃত, দু'জায়গায় নাম



জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে রাহুল গান্ধী বিরোধীদের একজোট করতে সক্ষম।

ইত্যাদি কারণে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। উচ্চ আদালত নজিরবিহীন রায় দেয়। বলা হয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দিয়ে বাতিল ভোটারদের আবেদন পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাঁদের মধ্যে কত জন যোগ্য ভোটার আছেন। নির্দেশ পেয়েই কাজ শুরু হয়। কিন্তু নির্বাচনের দিন ধার্য হয়ে যাওয়ায় মাত্র ৩০ লক্ষ ভোটার ভোটাধিকার পান। ৬৩ লক্ষ প্রথমে বাদ গিয়েছিল। এবার ২৭ লক্ষের ভাগ্য পরীক্ষার সময় পাওয়া গেল না।

জ্ঞানেশ কুমারের কার্যকলাপ শুরু থেকে নজর রাখলেই বুঝে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা ছিল না তিনি বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। তিনি যে এই অন্যায় কাজে নিযুক্ত তার প্রমাণও পাওয়া যায়। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ঝুলে থাকা বাকি ২৭ লক্ষ ভোটারের কি হবে? জ্ঞানেশ কুমার নির্বিকার চিত্তে বলেন, এখন তো আর ভোট নেই ওসব ভেবে আর কি হবে?



ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে ভারতের আপামর জনগণের সমর্থন আছে।

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর খবরে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পায়। ৩০ লক্ষ ভোটার ভোট দেওয়ার অধিকার পেলেও জ্ঞানেশ কুমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের অর্ধেকের বেশির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন তাঁদের ভোট দেওয়া রুখতে। ফলে তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। এই কাজে বাকি দু'জন নির্বাচন কমিশনার প্রথমে কিছুই জানতেন না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কত ভোটার বাদ গেল? প্রথমে ৬৩ লক্ষ, তারপর কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য ২৭ লক্ষ, আর নতুন করে নাম তুলিয়েও ভোট দিতে পারেননি প্রায় ১৬ লক্ষ। ৬৩ + ২৭ + ১৬ - এক কোটি ছয় লাখ।

জ্ঞানেশ কুমারের অপরাধ এখানেই শেষ নয়। নতুনভাবে নাম তোলার জন্য ৬ নম্বর ফর্ম ছিল। তাতেও উচ্চ আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নিজের খুশিমতো কাজ করেছেন জ্ঞানেশ কুমার। মারাত্মক অপরাধ। ফলে নতুনভাবে নাম তোলার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত দুর্নীতি করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে আপাতত ১৩ কোটি ভোটারের নাম বাদ গেছে সার-এ গোটা দেশে। এসব যে বিজেপিকে জেতাতেই করা হচ্ছে তা স্পষ্ট। জ্ঞানেশ কুমারের অপরাধ প্রমাণিত। তিনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নীতিহীন কাজ করেছেন। কোনও রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ বৈধ ভোটারকে ভোট দেওয়া থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করছেন। সাধারণভাবে ভাবলেই বোঝা যাবে কত বড় অপরাধ করেছেন তিনি। তাঁর খুবই কড়া শাস্তি হওয়া উচিৎ। সবথেকে বড় কথা, 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর খবর ফাঁস হওয়ার পর এই সংক্রান্ত আরও যে সব সংবাদ সামনে এসেছে সেখানেও দেখা যায় জ্ঞানেশ কুমার ভোটার লিস্টে ব্যাপক কারচুপি করেছেন।

জ্ঞানেশ কুমার-কাণ্ডে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল নির্বাচন কমিশন একটি স্বায়ত্ত্ব শাসিত স্বাধীন সংস্থা, কোনও রাজনৈতিক দলের অধীন নয়। এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ বিজেপির যুক্ত হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু তারাই জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করতে আসরে অবতীর্ণ। এতেই প্রমাণ হয় জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বিজেপির অবৈধ আঁতাতের। জ্ঞানেশ কুমার বে-আইনি কাজ করবেন বলেই তাঁর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আগেই করে রাখেন মোদিরা — তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের মাঝে-মাঝেই ককরোচ জনতা পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল মেটাতে কটু মন্তব্য করতে শোনা যাচ্ছে। আর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্যভাব। কিন্তু কেউ বলেননি, 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর সংবাদ সত্যি নয়। কারণ তাঁরা জানেন জ্ঞানেশ কুমার কি করেছেন সার-এর নামে।

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। অনুমান ইতিবাচক রায় পাওয়া যাবে না। কারণ উচ্চ আদালতে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে নির্বাচন কমিশনাররা তিনজন যৌথভাবেই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও আরও যে সব অভিযোগ ওই দৈনিক তুলেছে তাও খন্ডন করার জোর চেষ্টা হচ্ছে।

তবে এটাও ঠিক ধর্মেন্দ্র প্রধানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিরাটভাবে জেন জি জড়িত ছিল। ফলে আন্দোলনে জড়িতদের সংখ্যা অনেক বেশির সঙ্গে জোশও বিশাল ছিল। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার-কাণ্ডে জেনজি সেভাবে আগ্রহী হয়নি।

জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণ নিয়ে জোরদার আন্দোলন এখনও চলছে। দক্ষিণে বিশিষ্ট অভিনেতা প্রকাশ রাজ এর সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বলিউডের পরিচিত সেলিব্রিটিরা এই আন্দোলনে তাঁদের সমর্থন প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। অনেকে আন্দোলনে উপস্থিত হচ্ছেন। বিদেশে বসবাসকারী ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি ভারতে এসে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের নিশ্চিত ধারনা মোদিরা এবার কিছুতেই জ্ঞানেশ কুমারকে সরাবেন না। তাঁর অপরাধ মেনে নিলে সার-এর নিয়ম মেনে বিহার, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সেক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে। সেটা নিশ্চয় মোদিরা চাইবেন না। এছাড়া বারবার আন্দোলনের কাছে হার স্বীকার করলে তাঁদের ভাবমূর্তিতেও খুব বড় ধাক্কা লাগবে। সেই কারণে এবার কেন্দ্রীয় বিজেপি অত্যন্ত কড়া হাতে ককরোচ জনতা পার্টির শীর্ষ নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা সহ এই আন্দোলন থেকে দারুণভাবে উঠে আসা আইসা দলের সভানেত্রী নেহা বোরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর কোনও ঝামেলা করবেন না শর্তে তাঁদের জামিন হয়েছে। এর পর তাঁদের পক্ষে বড় পদক্ষেপ নেওয়া প্রায় অসম্ভব। তার থেকেও বড় কথা যত আন্দোলনই হোক সরকার যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে কি হবে? ব্যবস্থা নেবে না বলেই মনে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টও। তাই জ্ঞানেশ কুমার হটাও আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হবে। অন্য রকম কিছু হলে তা সত্যি অষ্টম আশ্চর্য। তবে দেশবাসী যা বোঝার বুঝে গেছেন। তাই জ্ঞানেশ কুমারও দিনের পর দিন দেশজুড়ে অপমান, ধিক্কার এমনকি বাড়ির দেওয়ালে চোর লিখে দেওয়া সত্ত্বেও মুখ বুজে সব সহ্য করছেন। বিরোধী নেতারা বলা শুরু করেছেন, *নেহা বোরা ক্রমশ সামনের সারিতে।* মোদিরা এখন জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচিয়ে দিলেও ২৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় ঘটলে তাঁর হাজতবাস নিশ্চিত। ■



হকার থেকে দেবরাজ চক্রবর্তীর উত্থান ও পতনের নেপথ্য কাহিনি

শোভনলাল রাহা

খুব অল্প সময়ে দেবরাজ চক্রবর্তী বঙ্গ রাজনীতিতে কীভাবে নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন? রাজনৈতিক মহলের দাবি, রকেট গতিতে দেবরাজ চক্রবর্তীর রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে। খুব অল্প সময়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই পাহাড়-প্রমাণ সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর। অন্তত ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বেনামে এবং আত্মীয়-পরিচিতদের নামে হস্তান্তরিত করার অভিযোগ ওঠে দেবরাজ এবং স্ত্রী অদিতির বিরুদ্ধে।

পাড়ার ছেলে পাপাই থেকে বিধাননগরের মেয়র ইন কাউন্সিল। ক্রমশ বাগুইহাটি-রাজারহাটের অঘোষিত মাফিয়া ডন হয়ে ওঠেন দেবরাজ চক্রবর্তী। কীভাবে রাস্তার সামান্য হকার থেকে কোটিপতি প্রোমোটার, সবার বুকে ভয় ধরিয়ে তৈরি করলেন তাঁর তোলাবাজির বিশাল সাম্রাজ্য? শুরুটা কীভাবে হয়েছিল? দেবরাজ গ্রেফতার হওয়ার পর সবটাই উঠে আসছে তদন্তে। সেই সূত্রেই সিটের তদন্তকারীদের নজরে এখন আরও ৩০ নাম।

সিটের দাবি, দেবরাজের সঙ্গে কমপক্ষে ৩০ জন এই দুর্নীতিতে যুক্ত। 'স্পেশাল ৩০' নামের এই চক্রটি তোলাবাজি ও দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী বিনিয়োগের কাজে যুক্ত ছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান। তাঁদের দিকে বিশেষ নজর রয়েছে তদন্তকারীদের।

দেবরাজ চক্রবর্তী প্রথমে ছিলেন প্রথম তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়ক। পরবর্তীতে বিধাননগর পুরনিগমের সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সেখান থেকে বাগুইহাটি-রাজারহাট, গোপালপুর ও নিউটাউনের বেতাজ বাদশা হয়ে ওঠেন। বিজেপি বিধায়ক তরুণ জ্যোতি তিওয়ারির অভিযোগ, ১,৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন দেবরাজ। এই ১,৩০০ কোটির হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির উৎস কী?

তদন্তে জানা গিয়েছে, বাগুইহাটি অঞ্চলে ফুটপাত দখল করে একের পর এক দোকান বসান দেবরাজ। রাজারহাট-গোপালপুর, চিনার পার্ক ও ভিআইপি রোডের ফুটপাতগুলি ছিল দেবরাজের আয়ের উৎস। সেখান



অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।



দেবরাজ চক্রবর্তী।

থেকেই তাঁর অনুগামীরা নিয়মিত তোলা তুলতেন। পুরসভা কিংবা সরকারি কোনও অনুমোদন বা অনুমতির তোয়াক্কা না করেই শুধু দেবরাজ চক্রবর্তীর নির্দেশেই চলত এই সমস্ত কারবার। সূত্রের খবর, এই কারবারে নাকি দেবরাজের ডান হাত ছিলেন মনীশ মুখোপাধ্যায়। কোথাও দৈনিক, কোথাও সাপ্তাহিক, আবার কোথাও মাসিক হারে তোলাবাজি চলত। পাশাপাশি এই অঞ্চলের প্রোমোটারদের কাছ থেকেও বিপুল পরিমাণ তোলা আদায় করতেন তাঁরা।

ধৃত দেবরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ যতই এগিয়েছে, ততই সামনে এসেছে তাঁর আর্থিক লেনদেন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন-নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিশেষ তদন্তকারী দল জানতে পেরেছে, দেবরাজের বিপুল পরিমাণ কালো টাকা এবং হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির খোঁজ মেলায় তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, দেবরাজের বাড়ি ও ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিস মিলেছে।

ইতিমধ্যেই দেবরাজ ঘনিষ্ঠ চারজনকে তলব করা হয়েছে। দেবরাজের স্ত্রী অদিতি মুন্সির ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করে আর্থিক লেনদেনের উৎস এবং সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সিট সূত্রে জানা গেছে 'ডিসি গ্লোবাল' নামের একটি সংস্থার মাধ্যমে দুর্নীতির কালো টাকা বাজারে বিনিয়োগ করে সাদা করা হতো। ডিসি গ্লোবাল খোলা হয় ২০১৫ সালে। ডিসি গ্লোবাল-এর আড়ালেই কোটি-কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। এই সংস্থার কোনও ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকলেও

সংস্থার নামেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এবং ভিন্ রাজ্য সম্পত্তি কেনা হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। তবে এই চক্রে শুধু একা দেবরাজ নন, তাঁর ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও জড়িত ছিলেন।

ভিআইপি রোডের ধারে কেষ্টপুর থেকে কৈখালি পর্যন্ত মাঝেমধ্যেই কিছু ব্যানার ও হোর্ডিং দেখা যেত। দেবরাজ চক্রবর্তীর ছবি দেওয়া বিশাল ওই হোর্ডিংগুলিতে লেখা থাকত, 'দেবরাজ নীতিতে বিশ্বাসী'। আসলে দলের অন্দরে সমান্তরাল ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তুলছিলেন দেবরাজ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী দেবরাজকে কোনও দিন কেউ নিজের ছবি দেওয়া এসব হোর্ডিংয়ের জন্য শো-কজ করেছে বলেও শোনা যায়নি। দেবরাজ অনুগামীদের তালিকায় ছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের গোটা ১০-১২ কাউন্সিলর, নিউটাউনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সবক'টি পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য এবং এক বিধায়ক। দক্ষিণ দমদম পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলরও দেবরাজ অনুগামী ছিলেন বলে শোনা যায়।



স্ত্রী অদিতি মুন্সির সঙ্গে।

তদন্তকারীদের নজরে থাকা স্পেশাল ৩০-এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত বিনু মণ্ডল, সুশোভন মণ্ডল ওরফে মাইকেল, রতন মৃধা, সম্রাট বড়ুয়া এবং গোপাল বাগুইকে তলব করা হয়েছে। আরও বেশ কয়েকজনকে তলব করা হতে পারে বলেই খবর। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া নথিপত্র এবং দেবরাজের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে তদন্তের জাল আরও ছড়াচ্ছে সিট।



গ্রেপ্তার হওয়ার পর।

রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর দেবরাজের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর সৌজন্যে। মন্ত্রী পূর্ণেন্দুকে জেঠু বলে ডাকতেন দেবরাজ। সেই পূর্ণেন্দুর কাছেই ২০১৩ সালে বিধাননগর পুরসভার উপ-নির্বাচনের টিকিটের দরবার করেছিলেন, পাননি। ২০১৫ সালেও তাঁর একই অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দু।

বিধাননগরে ভোটে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের সঙ্গে চরমে উঠেছিল দেবরাজের বিবাদ। শোনা গিয়েছিল, সেই বিবাদের জেরেই তৃণমূলের টিকিট পাননি তিনি।

এর পরে তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত। ২০১৫ সালে কংগ্রেসের হাত ধরেন দেবরাজ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর হাত থেকে দেবরাজ তুলে নেন কংগ্রেসের পতাকা। বিধাননগর পুরনিগম এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। যদিও সেই সিদ্ধান্তের জন্য খেসারতও কম দিতে হয়নি দেবরাজকে। ভোটের দিন তাঁকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। রাতে ছেড়ে দিয়ে আবার পরের দিন দক্ষিণ দমদমের এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় দেবরাজকে।

শোনা যায়, থানায় বসেই দেবরাজ এসএমএস পাঠিয়েছিলেন পূর্ণেন্দুকে; 'জেঠু, আমি অ্যারেস্ট হলাম। ভুল কিছু করিনি। তা-ও হলাম। প্রেসকে সব বলব তোমার আর দোলাদির ব্যাপারে। এত নীচে নামবে আমি জানতাম না। থ্যাঙ্ক ইউ।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলেননি দেবরাজ। তাঁর হয়ে বলেছিল তাঁর ভোটের ফল। ৩১২ ভোটে জিতেছিলেন বিধাননগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। জামিনে মুক্ত হয়ে কংগ্রেসের কাউন্সিলর হিসাবে শপথ নেন।

তবে কয়েক মাসের মধ্যেই 'হাত' ছেড়ে ফের ঘরের ছেলে ফিরে আসেন ঘরে। তৃণমূলে ভবনে এসে তৃণমূলের তৎকালীন যুব সভাপতি অভিষেকের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘাসফুলের পতাকা হাতে তুলে নেন। কয়েক মাসের মধ্যেই অভিষেকের 'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত হন দেবরাজ। ধীরে-ধীরে রাজনীতির ময়দানে নিজের জায়গা পাকা করেন। বিধাননগর তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একজন 'দাপুটে' নেতা হিসাবেও পরিচিত হন। এর কয়েক বছর পরে ২০১৮ সালে অদিতির সঙ্গে বিয়ে। জ্যাংড়া এলাকার বাসিন্দা দেবরাজ। অদিতি থাকতেন বাগুইআটিতে। কাছাকাছি এলাকা।

ঘটনাচক্রে যে পূর্ণেন্দু এক সময়ে দেবরাজকে টিকিট দিতে চাননি, সেই পূর্ণেন্দুকেই সরিয়ে দেবরাজের স্ত্রীকে টিকিট দেয় তৃণমূল। নিন্দুকেরা বলেন, দেবরাজই স্ত্রীর জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন দলের কাছে।

দেবরাজ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়। তাঁর ব্যবহার খুব ভাল। ব্যবহারে তিনি অনেক সময় মন জয় করে নিতেন। জনপ্রিয় কীর্তনশিল্পী অদিতি মুন্সী কিছুতেই দেবরাজকে তাঁর মনে স্থান দিতে চাননি। বরাবরই এড়িয়ে গেছেন। দেবরাজ — অদিতির মন পেতে লক্ষ-লক্ষ টাকা উপহার দিয়েছিলেন। অনেকটা জোর করেই বিয়ে করেন। এলাকাবাসী বলেছে, দেবরাজ জিতলে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে অনেকেরই হাল চূড়ান্ত খারাপ করে ছাড়ত। ■

অধিকাংশ মহিলা বার সিঙ্গার একই সঙ্গে অনেকের রক্ষিতা

সোনাগাছির প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল চিমাদের



দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন পর ডিউক বার কাম রেস্টুরেন্ট-এ গেলাম। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দপ্তরে যাওয়ার ডানদিকের রাস্তা পার করে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে এটি। সাংবাদিকতায় আসার পর শুনেছিলাম 'আনন্দবাজার'-এর কিছু বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক সময়-সুযোগমতো এখানে গলা ভিজিয়ে যান। সেই জন্য আমরাও গেছি। হয়েছে নানা অভিজ্ঞতা। মাঝে দীর্ঘ সময় যাওয়া হয়নি। হঠাৎ আবার গেলাম।

উদ্দেশ্য একটা ছিল। নতুন সরকারের আমলে কলকাতার সিঙ্গিং বার কাম রেস্টুরেন্টগুলির কি কোনও পরিবর্তন ঘটেছে? এর আগে 'চাঙওয়া', লিন্ডসে স্ট্রিটে 'মে ফেয়ার' সহ ধর্মতলা অঞ্চলে আরও কিছু সিঙ্গিং বার-এ গেছি। সব কিছু একইভাবে চললেও একটি বড় পরিবর্তন হয়েছে। আগে গভীর রাত অবধি সিঙ্গিং বারগুলি চললেও এখন রাত ১২টায় সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এক শ্রেণির মানুষ এই সব সিঙ্গিং বার-এ যেমন যেতেন এখনও যাচ্ছেন। এঁরা সত্যি গান শুনতে যান। অনেকে তাঁদের মনমতো গান গাইতে অনুরোধ করেন মহিলা বা পুরুষ সঙ্গীতশিল্পীকে। ভাল লাগলে সেই শিল্পীকে লাগাতার টাকা দিয়ে যান। ধরুন, একশো টাকা করে একটি গানের জন্য তিনবারে তিনশো টাকা। কখনও তারও বেশি। সেই বার সিঙ্গার এবং অন্যান্যরা এক রাতে কত গান গাইতে পারেন? ভেবে দেখুন ওই মানুষটি এক দিনে তাহলে কত টাকা দিতে পারেন? এমন কাস্টমার আরও থাকতেই পারে।

সে দিন ডিউক বার-এ গানের ক্ষেত্রে ৫৩ বছর আগের একটি ট্র্যাডিশন আজও চলছে প্রত্যক্ষ করলাম। ১৯৭৩-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'ইয়াদো কি বরাত'-এ হিন্দি ছবিতে প্রথম দেখা যায় একটি গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার একটি শুরু হচ্ছে। একনাগাড়ে এই ভাবে চারটি গান হয়, যা সুপারহিট হয়েছিল। ছবির প্রযোজক-পরিচালক নাসির হুসেন বিদেশের সিঙ্গিং বার-এ এমন দেখেছিলেন। তারই অনুকরণ করেছিলেন ওই ছবিতে। ধন্যবাদ ছবির সঙ্গীত পরিচালক রাহুলদেব বর্মণকে। তিনি ছবির টেম্পো অনুযায়ী এমন গান সৃষ্টি করেছিলেন যা আজও জনপ্রিয়। একইভাবে মানুষের মনে গেঁথে আছে পরপর চারটি গানের ব্যাপারটি।



হোটেলে উৎসাহী কাস্টমাররা।



এক শ্রেণির মানুষ যাঁরা ডান্স বার-এ যেতে চান না, তাঁরা মহিলা বার সিঙ্গারদের গান শুনতে যান।

সে দিন ডিউক-এ একসময়ে প্রথম গাওয়া হয় 'পিয়া তু'। সেটা শেষ হতেই একই নিঃশ্বাসে শুরু হয় 'শোনো মন বলি তোমায়'। তারপর 'দুনিয়া মে' শেষে 'দম মারো দম'। উপস্থিত সকলে খুবই এনজয় করেন, বোঝা যায় তাঁদের হাততালিতে।

ধর্মতলা চত্বরে সিঙ্গিং বার-এর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ধরলে সংখ্যাটি অনেক। এই সব সিঙ্গিং বার-এ আর যে কিছু হয় না তা নয়। কেউ কোনও বার সিঙ্গারকে মনে ধরলে বাড়তি টাকা দিয়ে তাঁর সঙ্গে ডুয়েট গান। তখন হাতে হাত লাগে। গানের সময় নিয়মিত টাকা দিয়ে গেলে হাতটা একটু বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায়। আর কিছু নয়। আবার কেউ-কেউ সঙ্গীতশিল্পীকে নাচের আবদার করেন। মহিলা সঙ্গীতশিল্পীরা যে সকলে ভাল নাচ জানেন তা নয়, যিনি জানেন তিনিই এই দায়িত্ব পালন করেন। এর জন্য এককালীন টাকা দিতে না হলেও মাঝে-মাঝে টাকা দিয়ে গেলে নাচের উদ্যম বৃদ্ধি পায়।

বার সিঙ্গার প্রায় সবারই লক্ষ্য থাকে উপস্থিত মানুষগুলির মধ্যে থেকে কাউকে বা একাধিক স্থায়ী বাবু হিসেবে ফিট করা। কাস্টমারদের মধ্যে কারও একই অভিপ্রায় থাকে। ব্যাপারটি সহজেই ঘটতে পারে। কয়েকবার গানের জন্য নিয়মিত টাকা দিয়ে গেলে দু'জনের মধ্যে একটা অলিখিত সেতু তৈরি হয়। একবার গান শেষ হলে মহিলা সঙ্গীতশিল্পীটি স্টেজ থেকে নেমে ওয়াশরুমে যাওয়ার নামে হল্ থেকে বের হন। তখন লোকটিও বের হয়ে কথা বলে ফোন নম্বর চেয়ে নেন। প্রথম পরিচয়ে তা না পেলেও কয়েকবার ওই বার-এ এসে একই ঘটনার পর ফোন নম্বর পেতে সমস্যা হয় না। তারপর যেমন টাকা দেওয়া হবে বার সিঙ্গারটি নিজেকে সেইমতো মেলে ধরবে। কিছু দিন এভাবে চলার পর তারা বাইরে দেখা করতে পারে। এরপর দু'জনে অন্য হোটেলে রাত কাটাতেও পারবে। কলকাতার বাইরেও যাওয়া যাবে। সহজেই এসব হতে পারে, কিন্তু-কিন্তু ভাবের জন্য শেষ অবধি হয়তো কিছুই হয়ে ওঠে না। তবে অতি উৎসাহীরা তাঁদের পছন্দমতো বার সিঙ্গারকে ঠিক রক্ষিতা বানিয়ে নেন। সিঙ্গিং বারগুলিতে বরাবরই এটা চলত, যা এখনও চলছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বার সিঙ্গারের একাধিক বাবু আছে। কেবল একজন হলে অনেক টাকা দিতে হবে, তাই একটা অ্যাভারেজ টাকা দিয়ে বার সিঙ্গারটিকে এক-এক জন তাঁর মতো বেঁধে রাখেন।

কোনও বার সিঙ্গার রক্ষিতা হওয়ার পর কাস্টমারটি নিজের গুরুত্ব বাড়াতে স্টেজ থেকে মেয়েটিকে ডেকে তাঁর সঙ্গে মদ্যপানের সঙ্গী বানাতে পারেন। এতে ওই বার সিঙ্গারটির ডিমান্ড বাড়তে বা কমতেও পারে। কারণ মেয়েটি প্রকাশ্যে কারও সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে দিলে বাকিরা তাঁর প্রতি উৎসাহ হারাতে পারে। মেয়েটির মধ্যে কোনও 'ব্যাপার' থাকলে তাঁকে নিয়ে অন্য কাস্টমারের সঙ্গে রেষারেষি শুরুও হতে পারে।

বার সিঙ্গারদের নিয়ে 'ট্র্যাজিক' ঘটনা হল, সকলেই যে বে-পথে যেতে চায় তা নয়। অনেকে অন্যদের দেখে ওই পথে যায়। বে-পথে যেতে না চাইলে বার সিঙ্গারদের যিনি নিযুক্ত করেন তিনি জোর করে তাঁকে ওই কাজ করতে বাধ্য করেন। কারণ তাতে তাঁর বাড়তি রোজগার হয়। অনেক সময় কাস্টমারদের তরফেও গোপন চাপ থাকে সেই বার সিঙ্গারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার।

মনে হতে পারে যে সব বার-এ নাচ হয় সেখানে গেলে তো আঙ্গুরও সুযোগ। কিন্তু যাঁরা সিঙ্গিং বার-এ গিয়ে কোনও মহিলা সঙ্গীতশিল্পীকে রক্ষিতা বানান তাঁরা পয়সাওয়ালা মানুষ। তাঁদের ওই জগতে আলাদা কদর। ধর্মতলা অঞ্চলে রাতের দিকে তাঁদের নিয়ে টানাটানি চলে সিঙ্গিং বার-এর সামনে থাকা কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত করা মানুষদের মধ্যে। ওই সব কাস্টমারের পক্ষে ডান্স বার-এ যাওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি নিষিদ্ধপল্লীতেও। স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার করতেই এ সব করেন। আমার যেমন সেদিন ডিউক-এ লাল সিফন শাড়ি পরা বার সিঙ্গারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনিও তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বার দুয়েক স্টেজ শো থেকে বাইরে যান। আমি আর অগ্রসর হইনি।



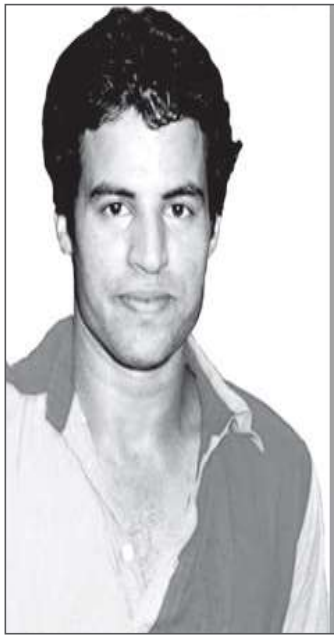
নিষিদ্ধপল্লী সোনাগাছী।

বার সিঙ্গারদের ভূমিকা কখনওই শালীনতার সীমা ছাড়ায় না। তাঁদের পোশাক-আশাকও অশোভন নয়। কখনওই কোনও কাস্টমারকে ফাঁসাতে ছলা-কলা দেখান না। কেউ আগ্রহ দেখালেই তাঁরা উদ্যোগী হন, তার আগে নয়। ফিট হলে কখনও তাঁদের পারিবারিক জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করেন না। কাস্টমাররা তাঁকে গানের জন্য যে টাকা দেন তার ৫০ শতাংশ বার সিঙ্গারটি

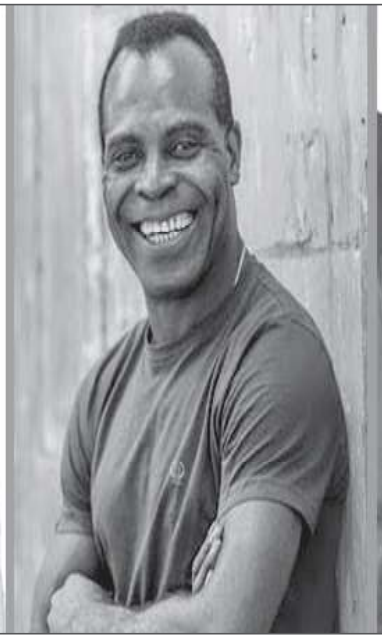
পান। কিছু না পেলে তাঁকে যে নিযুক্ত করেছেন তিনি গাড়ি ভাড়া বাবদ দৈনিক ৫০০ টাকা দেন। এই জন্যই এঁরা যত্ন নিয়ে গান করেন। বার সিঙ্গারদের ক্ষেত্রেও যত দিন রূপ-যৌবন তত দিন ডিমান্ড। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাঁদের ওইভাবে টাকা রোজগার। সবই সাধারণ ঘরের, বেশিরভাগের স্বামী না থাকলেও সন্তান বা পরিবার আছে। বার সিঙ্গারের জীবন শেষের পর তাঁদের কি হয় তার খোঁজ কে রাখে।

ডিউক-এ আমি একা যাইনি, সঙ্গে তিনজন বন্ধু ছিল। কয়েক দিন পর রাতের দিকে কাজকর্ম শেষে আমরা আড্ডায় মিলিত হলাম সেদিন ওই তিনজন ছাড়াও বন্ধুস্থানীয় একজন পুলিশ অফিসার ছিল। তাকে ডিউক-এর ঘটনা বলছিলাম। অনেক বছর আগে একদিন দুপুরে ডিউকে দেখেছিলাম বার ফ্লোরে প্রচুর মদ খেয়ে ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী লুটোপুটি খাচ্ছেন। খেলা ছাড়ার পরের ঘটনা। ওই পুলিশ অফিসারটি একসময় কলকাতা ময়দানে ফুটবল, ক্রিকেটে খেলেছে। স্পোর্টস লাভার। আমরা একসঙ্গে টিভিতে খেলা দেখি। আমি সমরেশের ঘটনাটি বলায় আলোচনা বার সিঙ্গার থেকে ফুটবলারদের মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে চলে গেল। বলা ভাল, পুলিশ অফিসারটি বলল আমরা শুনলাম।

পুলিশ অফিসারটি জানায়, আমারও শুনেছি, খেলা ছাড়ার পর বিখ্যাত ফুটবলাররা সময় কাটানো নিয়ে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েন। অনেকেই কোচিং বা ধারাভাষ্যকার হলে বেঁচে যান। বাকীরা পড়েন বিপাকে। তাস খেলে আর কত সময় কাটানো যায়। তখন অনেক প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরীর মতো চূড়ান্ত মদ্যপানে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশ অফিসারটি ইস্টবেঙ্গলের দোর্দন্ডপ্রতাপশালী এক স্টপারের কথা বলেন, যাঁকে নিয়মিত পুলিশ ক্লাব থেকে টলমল অবস্থায় যেতে দেখা যেত। আশ্বা বার কলকাতা ফুটবলের বিখ্যাত এক জুটির যাঁর মধ্যে একজন প্রয়াত, বাকি জনের কথা পুলিশ অফিসারটি বলে। মিডফিল্ডার সেই ফুটবলারটি একবার মদ্যপানের পর সোনাগাছি নিষিদ্ধপল্লীতে ধরা পড়েন। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সে দিন ওখানে ডিউটিতে থাকা পুলিশরা চিনতে পারেনি ফুটবলারটিকে। এই পুলিশ অফিসার চিনতে পেরে উর্দ্ধতন অফিসারকে বলে বিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলারকে থানা থেকে রিলিজের ব্যবস্থা করে।



মজিদ।



চিমা।



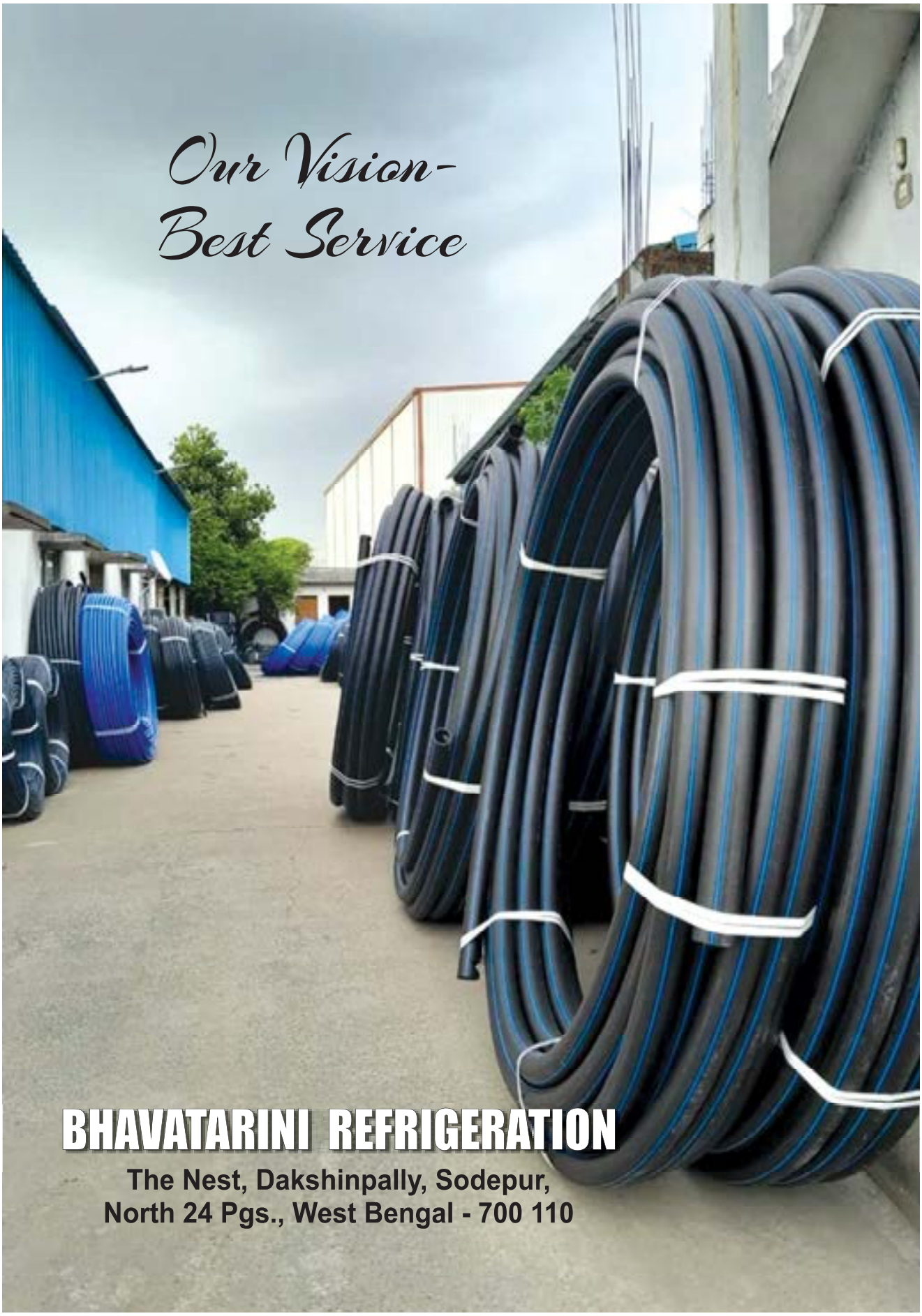
চিবুজার।

আলোচনা ঘুরে যায় বিখ্যাত ফুটবলারদের সোনাগাছি-প্রীতির দিকে। তখন বিদেশি ফুটবলাররা একাই আসতেন। এখনকার মতো স্ত্রী বা বান্ধবীকে নিয়ে নয়। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা এখনকার মতো ফাইভ স্টার ছিল না। অনেকে ক্লাব মেসে থাকতেন। কেউ-কেউ ক্লাবের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। ওই সব ফুটবলাররা রাতের দিকে নিঃসঙ্গবোধ করতেন। তখন তাঁকে ঠিকমতো গাইড করার কেউ না থাকলেই বিপদ। ঠিক এই কারণেই সোনাগাছিতে ধরা পড়েন কলকাতা ময়দানে আসা অন্যতম সেরা বিদেশি মজিদ বাসকর। এই নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। আসলে কলকাতার নিষিদ্ধপল্লী হিসেবে সোনাগাছির বিশেষ পরিচিতি আছে। তা নিয়ে বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যেও কৌতুহল কাজ করত।

ওই সময় কলকাতা ময়দানে নিয়মিত নাইজেরিয়ান ফুটবলাররা আসতেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা নাইজেরিয়ানদেরও কলকাতা ময়দানে নিয়ে আসা হতো। নাইজেরিয়ানদের মধ্যে সোনাগাছির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। চিমা ওকোরি, চিবুজার সহ বহু নাইজেরিয়ান সোনাগাছি এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও মেয়ের ঘরে যাননি। মেয়েরাও নাইজেরিয়ানদের বড় শরীর দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত। ওরা জানত একবার ঘরে ঢুকে পড়লে সর্বনাশ। দশ দিন 'কাজ' করতে পারবে না। চিমারা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের দেখতেন আর বিয়ার খেতেন। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ওই সময় কলকাতা ময়দানে নিয়মিত নাইজেরিয়ান ফুটবলাররা আসতেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা নাইজেরিয়ানদেরও কলকাতা ময়দানে নিয়ে আসা হতো। নাইজেরিয়ানদের মধ্যে সোনাগাছির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। চিমা ওকোরি, চিবুজার সহ বহু নাইজেরিয়ান সোনাগাছি এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও মেয়ের ঘরে যাননি। মেয়েরাও নাইজেরিয়ানদের বড় শরীর দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত। ওরা জানত একবার ঘরে ঢুকে পড়লে সর্বনাশ। দশ দিন 'কাজ' করতে পারবে না। চিমারা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের দেখতেন আর বিয়ার খেতেন। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

আস্তে-আস্তে কলকাতা ফুটবলের চরিত্র বদলে যায়। বন্ধ হয় এই কালচার। ■


Our Vision-
Best Service
BHAVATARINI REFRIGERATION
The Nest, Dakshinpally, Sodepur,
North 24 Pgs., West Bengal - 700 110

উত্তর কলকাতার অতি পরিচিত কো-এড কলেজের সামনে মেয়েরা নেশা করছে



অরিন্দম মিত্র

জুন সংখ্যার 'সময় পরিবর্তন'-এ বলেছিলাম, একশ্রেণি মেয়ের মধ্যে ভাঙ-এর নেশা ক্রমশ বাড়ছে। উত্তর কলকাতার হেদুয়া সংলগ্ন একটি সরবতের দোকানের উল্লেখ করেছিলাম, যেখানে সরবতের সঙ্গে হিসেব করে ভাঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাতে নেশা হলেও এখনও অবধি হইচই পড়ে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি। অবাধে চলছে মেয়েদের ভাঙ-এর নেশার ঠেকটি। আমরা বলেছি, কলকাতার আরও কোথাও মেয়েদের ভাঙ-এর নেশার ব্যবস্থা আছে। আমাদের সামান্য যোগাযোগে যেটুকু সংবাদ পেয়েছি, তাই প্রকাশ করেছি, প্রশাসন যদি চায় তাহলে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে বিজেপি সরকারের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা চাইছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রকৃত মঙ্গল। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন। তবে প্রায় প্রতিটি উদ্যোগের আগে তারা পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছে, সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার। বিজেপি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমরা মেয়েদের নেশা নিয়ে আবার একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ তুলে ধরছি। মনে করলে তারা অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। এবারের সংবাদটির গুরুত্ব অনেক বেশি। এতে যুক্ত সদ্য কলেজে যোগ দেওয়া মেয়েরা।

স্কুলের সীমা পার করে কলেজে প্রবেশ করলেই একশ্রেণি মেয়ের মধ্যে 'দুষ্টুমি' করার প্রবণতা যেন বৃদ্ধি পায়। যুগ-যুগ ধরে তা হয়ে আসছে। এর প্রথম ধাপ সিগারেট খাওয়া। কম বয়সী মেয়েদের মধ্যে স্মোক করা অবশ্য আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

'সময় পরিবর্তন' দপ্তরে আসার জন্য আমি প্রধান রাস্তা ছেড়ে একটা গলির পথ ব্যবহার করি। সেখান থেকে বড় রাস্তায় যাওয়া যায়। আমি যখন অফিস যাই তখন দুপুর প্রায় পৌনে একটা হবে। মাঝে-মাঝে দেখি, ওই পথের একটি সিগারেট পাওয়া যায় দোকান থেকে সদ্য কলেজে যোগ দেওয়া (দেখে তাই মনে হয়) দুটি মেয়ে সিগারেট কিনে দিব্যি ধরিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অপরদিকে দাঁড়ানো আরও দুই বান্ধবীর সঙ্গে চলেছে। মেয়েগুলির বয়স কত হবে — ১৬/১৭। একদিন নয়, ঘটনাচক্রে আরও কয়েক দিন তাদের ওই কার্যকলাপ দেখেছি। মেয়েদের নেশা থেকে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করার নিদর্শন শহর কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। দিনের আলোতে এর ধরন এরকম আবার রাতের অন্ধকারে আরও বিপজ্জনক। এবার আসা যাক এবারের সংবাদে।

শ্যামবাজারের মেট্রো স্টেশনের কাছেই আছে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ। এখানে তিনবেলা কলেজ চলে — মর্নিং, ডে এবং নাইট। ডে কলেজের নাম মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ। মর্নিং ও নাইট কলেজের অন্য নাম। কো-এডুকেশন। পথ চলতিরা দেখতে পাবেন কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের। আমরা খবর পেলাম, ওই কলেজের একশ্রেণির মেয়ে সিগারেট খাওয়ার নামে গাঁজা বা ওই জাতীয় নেশা করছে। বাজারে গো-গো নামে লম্বা সিগারেট পাওয়া যায়। কলেজের সামনের দোকানগুলিতে মিলবে। এক-একটির দাম দু'টাকা। এর মধ্যে মেয়েরা গাঁজা বা অন্য নেশার বস্তুটি মিশিয়ে নিচ্ছে। গো-গো হচ্ছে আগে যেমন অনেকে সিগারেটের পাতা হাতে রোল করে তাতে প্যাকেটজাত তামাক মিশিয়ে খেত, ঠিক তেমনি। এখন মেয়েরা গো-গো-র মধ্যে গাঁজা বা অন্য নেশার বস্তু মিশিয়ে সিগারেট খাওয়ার মতো খাচ্ছে। দেখে একঝলক মনে হবে আজকালকার অল্পবয়সী মেয়েরা যেমন স্মোক করে তেমনি। কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভবই হবে না আসলে মেয়েটি কি খাচ্ছে? অনুমান, গাঁজা বা অন্য নেশার সামগ্রী কলেজের আশেপাশে পাওয়া যায়। গো-গোকে নেশার মাধ্যম বানানোয় দাম নেওয়া হচ্ছে একটির ১০ টাকা। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, কখনও-সখনও নেশার মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় কোনও মেয়েকে প্রকাশ্যে অশোভনীয় আচরণ করতেও দেখা যায়। ভাবতে পারেন কি সাংঘাতিক ব্যাপার। সদ্য কলেজে যোগ দেওয়া একশ্রেণির মেয়ে সিগারেটের মধ্যে গাঁজা মিশিয়ে খাচ্ছে। টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলিতে উঠতি অভিনেত্রীদের মধ্যে এমনটি আমরা দেখে থাকি।

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্রীদের কীর্তি ফাঁস করলাম। এমনটা নিশ্চয়ই আরও কলেজের সামনে ঘটছে। সেটা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। পূর্ব বর্ধমানে কিছু দিন আগে গ্রেপ্তার হওয়া সন্ত্রাসবাদী হামিমের বান্ধবী বাঙালি অর্পিতা সরকার ধরা পরার পর মনে হচ্ছে এখনকার মেয়েদের পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। ■



AJ ENTERPRISE

Professionally Managed Real Estate Development Company

Midnapur Town

Ph. No. : 8001109259

ঝাড়গ্রামে দীর্ঘ দিনের বে-আইনি কারখানাটি পালাবদলের পরেও রমরমিয়ে চলছে

জয়নাথ রায়

ঝাড়গ্রাম জেলার একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সাধু রামচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়' এক তীব্র পরিবেশগত সঙ্কটের মুখোমুখি। বিশ্ববিদ্যালয়টি যেখানে স্থাপিত, তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং নিকটবর্তী ভারি শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত কার্যাবলীর কারণে সমগ্র ক্যাম্পাস এলাকাটি অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়েছে। সংলগ্ন স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধূলিকণা ও ধোঁয়া প্রতিনিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ ও বাতাসকে গ্রাস করছে, যার ফলে ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদের স্বাস্থ্য চরম বিপদের মুখে।



দূষণের তীব্রতা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ঢিলছোঁড়া দূরত্বেই অবস্থিত একাধিক স্পঞ্জ আয়রন এবং ফেরো অ্যালয়েড কারখানা। এই কারখানাগুলিতে লোহা, আকরিক ও কয়লা পোড়ানোর মাধ্যমে স্পঞ্জ আয়রন তৈরির প্রক্রিয়া চলে। বিষাক্ত ডাস্টের আস্তরন, কারখানাগুলির চিমনি থেকে নির্গত সূদ কালো ছাই, লোহার গুঁড়ো এবং সালফার-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড মিশ্রিত ধাতব কণা প্রধানত পিএম (২.৫) এবং পিএম (১০) বাতাসের মাধ্যমে উড়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আছড়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নতুন ভবন, ক্লাস রুম, জানালার গ্রিল, হোস্টেল এবং বসার জায়গাগুলিতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে কালো ধূলোর মোটা স্তর জমে থাকছে। এমনকি ক্যাম্পাসের খোলা জলাশয়, পানীয় জলের উৎস এবং ছাদের জলের ট্যাঙ্কগুলিও বিষাক্ত ছাইয়ের কারণে পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জনস্বাস্থ্য ও মানসিক স্থিতি

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি হল তার সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

শারীরিক অসুস্থতা

বাতাসে ভাসমান এই সূদ কণাগুলি ফুসফুসে প্রবেশ করায় শিক্ষার্থী ও কর্মীদের মধ্যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানির (অ্যাসমা) দীর্ঘ মেয়াদের ফলে সিলিকোসিস-এর মতো নিরাময়হীন ব্যাধি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। এছাড়াও প্রতিনিয়ত ছাই পড়ার ফলে চোখের ইনফেকশন এবং ত্বকে এলার্জির প্রকোপ বাড়ছে।

মানসিক ক্লান্তি ও পড়াশোনায় ব্যাঘাত

সারাক্ষণ দূষিত কালো ধোঁয়া এবং কারখানার যান্ত্রিক কোলাহলের মধ্যে থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছে। ফলে তাদের মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ গ্রাস করছে।

ক্যাম্পাস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা ও বিকল্প সমাধান

কারখানাগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (পিসিবি) নিয়মাবলীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলার প্রবণতা এবং এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবিলম্বে একটি উপযুক্ত নিরাপদ গ্রিন জোনে স্থানান্তরিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রামের সচেতন নাগরিক সমাজ একটি সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবায়নের যোগ্য প্রস্তাব প্রশাসনের সামনে তুলে ধরেছেন।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জমি অদল-বদল

রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় একটি বিশেষ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করা যেতে পারে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ও পরিকাঠামো সংলগ্ন কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হোক, যা তাদের শিল্প সম্প্রসারণ ও গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। বিনিময়ে বিকল্প জায়গা ও একই পরিকাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে দিতে হবে।

কেন অভিযুক্ত কারখানাটি?

এই দাবির কেন্দ্রে রয়েছে ইস্পাত কারখানাটি। নব্বই-এর দশকে এই কোম্পানি তাদের টিএমটি বার তৈরির কারখানা গড়ে ঝাড়গ্রাম শহরের অধুনা ৩ নং এলাকায় পাদপীঠ এলাকায়। রেলের লোহা চুরি সংক্রান্ত কারণে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়।

মালিকগোষ্ঠী এরপর নামে সিমেন্ট উৎপাদনে। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৫ কিমি দূরে বরিয়া শহরে তাদের কারখানা স্থাপন করে। ঘন শাল, মহুয়া, পিয়াশাল জঙ্গলের মাঝখানে তাদের কারখানা। ওই সিমেন্ট কারখানা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে স্থাপিত হয় ১৯৯৫ সালে এই আলোচিত ইস্পাত কারখানা। পেছনের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, সেখানকার পরিবেশ ছিল ভীষণ প্রাকৃতিক। মুক্ত আলো, বিশুদ্ধ বাতাস। এই এলাকায় একদা অসংখ্য ইংরেজ, সরকারি আমলা, পরে অনেক বড়-বড় কংগ্রেস নেতার বাংলো বা বাগান বাড়ি ছিল। সবথেকে আকর্ষণীয় ছিল দমদমের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ দেবী ঘোষালের গোলাপ বাগান। প্রায় চারশো প্রজাতির গোলাপ ফুলের বাগিচা। ওখানে বিশিষ্ট সমাজসেবী নরেশ দাশগুপ্ত 'বিকাশ ভারতী' নামে একটা স্বেচ্ছাশ্রম শুরু করেন। পরবর্তীকালে

এনজিও-তে রূপান্তর করেন। গড়ে ওঠে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেবাকেন্দ্র, হাসপাতাল, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি। পুরনো বাংলো সহ কাজুবাদাম প্রসেসিং কারখানা। সমস্ত এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে অসংখ্য রিসোর্ট ও হোমস্টে।

সব নিষ্প্রাণ ও আতঙ্কিত

আজ দূষণের কারণে সবই নিষ্প্রাণ ও আতঙ্কিত। চারদিকে আকর পোড়ানোর কালো ছাই। ঝড় উঠলে কালো ছাই চারদিকে কালো আস্তরণ ফেলে দেয়, তা গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে শোওয়ার ঘর হয়ে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

সারা বিশ্বে কোনও দেশে পানীয় জলে কারখানা চলে না। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে চলছে এই ইস্পাত কারখানা। প্রাক্তন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার জেলা সভাপতি নির্মল হাঁসদা বলেন, কথা ছিল সুবর্ণরেখা নদী থেকে ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনে কারখানায় পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা হবে। সেই জলে কারখানা চলবে।

এ ব্যাপারে ভূগোলের অধ্যাপিকা শীলা রায় বলেন, সারা ঝাড়গ্রাম পৌরসভার একলাখ মানুষ এক মাসে যে জল ব্যবহার করেন তার চারগুণ জল প্রতিদিন ইস্পাত কারখানা ব্যবহার করে। জীতুশোল, পাডরো, বাঘমুড়ি, শালবনী এলাকায় পাতকুয়োর জল চল্লিশ ফুট নিচে নেমে গেছে। সমস্ত জেনেশুনে প্রশাসন সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা নীরব।

আরও বিস্তার

আজ চারটি ইউনিট নিয়ে এই কারখানা ভেতরে-ভেতরে বাঘমুড়ি, শালবনী এলাকা দখল নিয়েছে। বন দপ্তরের জায়গা একরের পর একর বেদখল। লোধা, সাঁওতাল, কুর্মীদের চাষের জমি দখল। অনেক সময় ভয় দেখিয়ে বা টাকার প্রলোভনে ডাম্পার-ডাম্পার ছাই ফেলে জমি দখল। এই জমি দখলের পরিকল্পনা প্রথম ছিল সুভাষ সরকারের, যদিও তিনি আজ প্রয়াত। তাঁর জায়গায় এসেছেন ভূমি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। তারপর আরও আগ্রাসন জমি দখলে। সাধারণ মানুষ অসহায়। ঘরে-ঘরে শ্বাসকষ্টের রোগী। কোনও ফলের গাছে ফল ধরে না। সব সময় পাতা, ফুল কালো ছাইয়ের আস্তরনে ঢাকা পড়ে থাকে। সাদা গরু চরতে গেলে রং হারিয়ে ছাই রঙের হয়ে যায়।

আট কিলোমিটার দূরে ঝাড়গ্রাম শহর। ওখানে ওড়িশার খনি থেকে আকরিক আসে রেল ঘোরাধরা এলাকাকে খালি করে। ওখান থেকে ডাম্পারে-ডাম্পারে সেই আকরিক যায় ইস্পাত কারখানায়। আজ ওই ধুলোর দূষণে জর্জরিত ঝাড়গ্রাম শহরের ১০, ১১, ১২, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। বিশেষ করে কদমকানন, শীতলডিহি, নৃপেনপল্লী, খাস জঙ্গল এলাকা সহ পুরনো ঝাড়গ্রাম, কলাবনী, বরিয়া, শিরিষা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা।

ঝাড়গ্রাম শহরের বেশিরভাগ বখাটেদের নিয়োগ করেছে। তাদের একমাত্র কাজ সাধারণ মানুষকে ভয়, আতঙ্কে রাখা। পরিবেশ এত খারাপ যে ঝাড়খন্ড, ওড়িশা থেকে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে। হামেশাই বয়লারের তপ্ত আগুনে শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। শুধু তাই নয়, আগুনের তেজ এত তীব্র যে কয়েক মিনিটে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কেউ ক্ষতিপূরণ পেল তো পেল, না হলে পেলই না। অফিসে সমস্ত আধিকারিক বহিরাগত। কোনও রকম দূষণ প্রতিরোধ আইন মানা হয় না। তা ছত্রে-ছত্রে খোলা চিঠিতে লিখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।



কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধূলিকণা ও ধোঁয়াতে বিপাকে স্থানীয় মানুষ।

অভিযোগে জানা যায়, মালিকগোষ্ঠী একদিকে যেমন প্রশাসনের কর্তা থেকে আধিকারিক সহ রাজনৈতিক নেতাদের বশীকরণ করে রেখেছে, তেমনি তৈরি করেছে এক অত্যাধুনিক বিলাসবহুল অতিথি আবাস, যেখানে পরিষেবা পান আয়কর, জিএসটি থেকে ইডির বেশিরভাগ অফিসার। গত বছর ইডি রেড করে তিন দিন ধরে। তারপর চুপচাপ। একই রকমভাবে চলছে কারখানা।

প্রতিবাদ নেই

একমাত্র প্রতিবাদ করতে পারত চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম। তাও তারা বশীকরণ করে নিয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক দৈনিকের সাংবাদিকদের ভাষায় ওরা এত শক্তিশালী যে আমরা কলম চালাতে পারিনি। স্থানীয় সাংবাদিকরা অনেকে বশীকরণ মন্ত্রে বশীভূত। আজ থেকে পরেরো বছর আগে এদের অন্যায় নিয়ে বলিষ্ঠ প্রতিবেদন করেছিল ‘কোলফিল্ড টাইমস’। সেই সাংবাদিককে নানা প্রলোভন দিয়েছিল কিন্তু তিনি কোনও ফাঁদে পা দেননি।

এলাকায় কান পাতলে শোনা যায় মালিকপক্ষের সঙ্গে তৃণমূল আমলে সর্ব শক্তিমান এমন একজনের হট লাইন যোগাযোগ ছিল যে পুলিশ-প্রশাসন ঠুটো জগন্নাথ। সরাসরি উপোটোকন নিয়মিত যেত। আজ সরকার বদল। মালিকপক্ষও দল বদল করে ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে। গত জুন মাসে কারখানার শ্রমিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলের রাজ্যের এক মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে খড়গপুরে যোগ প্রদর্শনীতে পাশাপাশি দেখা যায় রাজ্যের দোর্দোণ্ডপ্রতাপ এক মন্ত্রী ও কারখানাটির কর্ণধারকে। অন্যদিকে যোগ প্রদর্শনীতে এক বিধায়ক। সবার পরনে ছিল কোম্পানির লোগো সম্বলিত গেঞ্জি।

অথচ ভোটের আগে ওই এলাকায় আজকের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন অবৈধভাবে জবরদখল করা সব জায়গা ফেরত নেওয়া হবে। বন দপ্তরের সব জায়গা উদ্ধার করা হবে। কোনও ভাবেই ভূগর্ভস্থ জলে কারখানা চলবে না। পরিবেশ দূষণ মানা যাবে না।

নতুন সরকারের প্রায় ছ’মাস হয়ে গেল। দূষণ কারখানাটি স্বমহিমায়। কোনও পরিবর্তন নেই। সেদিন তৃণমূল ছিল আজ পাশে বিজেপি। কোনও দিন গোটা ঝাড়গ্রামবাসী সকালে উঠে শুনবে ভূগর্ভস্থ পানীয় জল ১২০০ ফুট নিচে নেমে গেছে তখন হয়তো টনক নড়বে প্রশাসনের। ■

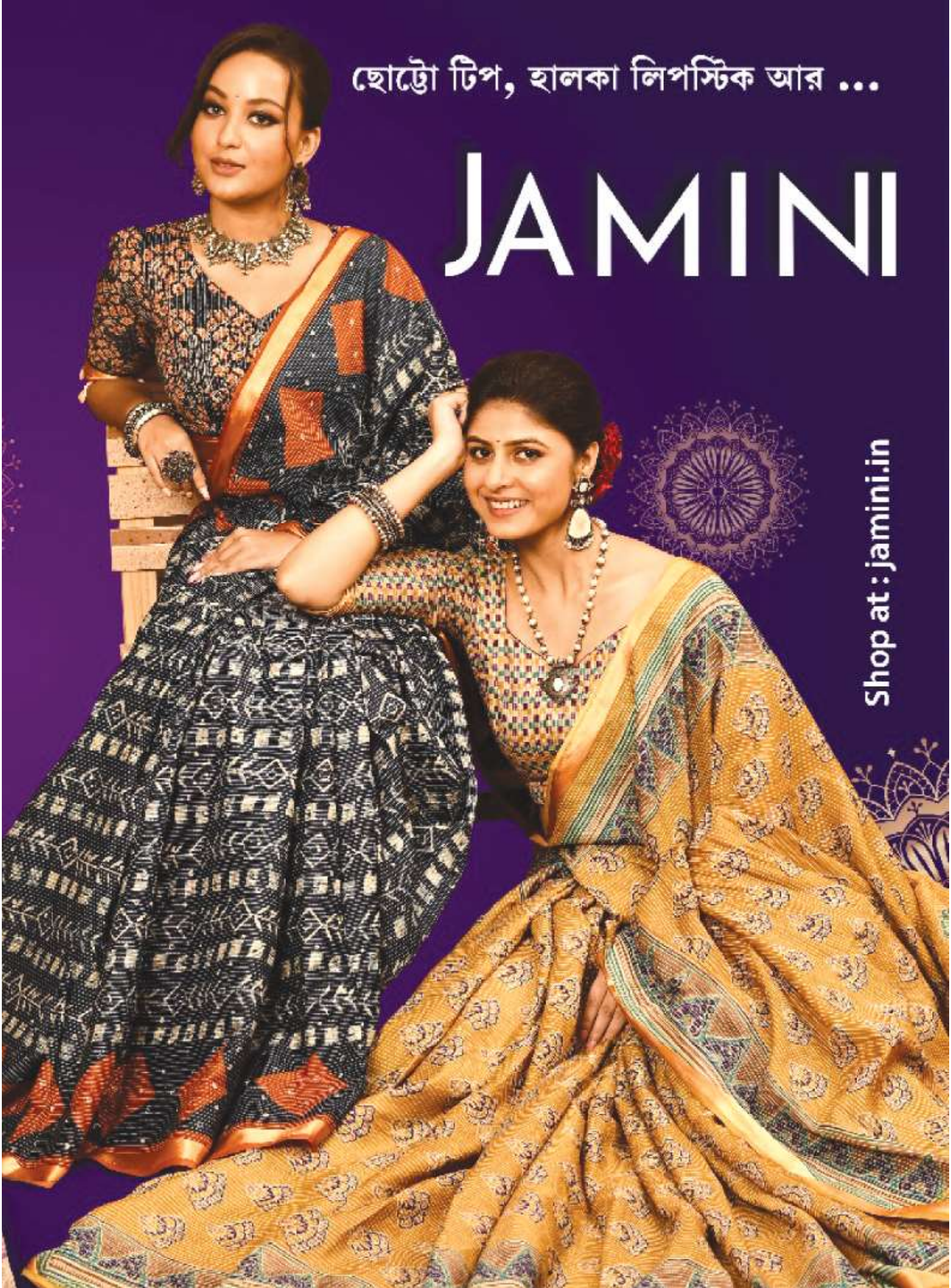


শাড়ি, কুর্তি, বেডশীট, নাইটি

ছোট্ট টিপ হাল্কা লিপস্টিক আর...

Jamini®




ছোট্টো টিপ, হালকা লিপস্টিক আর ...
JAMINI
Shop at : jamini.in


India International
Mega Trade Fair
• Kolkata • Patna • Bhubaneswar • Ranchi • Mumbai
• Surat • Vadodara • Ahmedabad • Indore
• Chandigarh • Lucknow • Allahabad
• Gurugram • Amritsar • Varanasi • Kanpur
• Visakhapatman • Agartala
HAPPY
Diwali
FESTIVAL OF LIGHTS
Organised by :
BCC&I
AIDING BUSINESS SINCE 1833
GS MARKETING
ASSOCIATES PVT. LTD.
224, AJC Bose Road, "Krishna Building"
Room No. 1006-1009, 10th Floor, Kolkata - 700 017
Contact Persons
Achintya Ghorai : +91 82968 78363 Amitava Ghosh : +91 84202 24305
Mail ID : gsmacal@gmail.com Website : http://www.gsmktg.com

নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য - ৭২

স্বাধীন ভারতে লালকেল্লার প্রথম ভাষণে সুভাষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেহরু

অরূপ বসু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইংরেজ জয় পেয়েছে। আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষিত যুদ্ধের অবসান হয়েছে এমন কথা ঘোষণা না করলেও আজাদ হিন্দ সেনানায়করা সারেন্ডার করেছে বা ধরা পড়েছে। লালকেল্লার বিচারপর্বে তাদের কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কারও বিচার চলছে। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধের জন্য কারও মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যে হবে না এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। কেবল সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষ ধরা পড়লে তাঁকে যে ছেড়ে দেবে না সেটাও বোঝা যাচ্ছে। পাশাপাশি এটাও বোঝা যাচ্ছে ইংরেজদের সে তেজ আর নেই। জিতেও যেন হেরে গেছে। তাদের আচরণে হরষে বিষাদ। নেতাজি সুভাষ এবং তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য তাদের হয়তো ভারত ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ভারতের মতো উপনিবেশ সবচেয়ে বেশি রসদ জোগাতে পারে। কিন্তু তাকে কি আর ধরে রাখা যাবে! রেড ফোর্ড ট্রায়ালে তেমন শাস্তি না দেওয়াতেই যে পরিস্থিতি তাতে আর একটি বিয়াল্লিশ কিংবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনও আন্দোলন দেখা দেবে। এবার হয়তো ব্রিটিশ এমনকি ইউরোপীয় পরিবারগুলোর ওপর হিংস্র আঘাত আসবে। তাকে পণ্ড করার ক্ষমতা কংগ্রেস নেতাদের নেই।



প্রেমকুমার সায়গল ও নেতাজি।

ইংরেজ শাসকের এই মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়েছে লর্ড ওয়াভেলের একটি সরকারি লিখিত বিবৃতিতে আর ভারতীয় বণিকসভার ভুলাভাই দেশাইয়ের ইঙ্গিতবাহী ভাষণে।

বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে এক বণিক সভায় কংগ্রেস নেতা ও রেডফোর্ট ট্রায়ালে প্রেম, ধীলন, শাহনাওয়াজের পক্ষে সমর্থনকারী আইনজীবী ভুলাভাই দেশাই বলেছেন বিচার শেষ হওয়ার আগেই লন্ডনে এই নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। লেবার গভর্নমেন্ট ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি তখন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। বোঝা যাচ্ছে আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। আপনাদের হয়তো আর এর জন্য কোনও লড়াই করতে হবে না। কিন্তু এটা জেনে ভাল লাগে যে, অন্তত পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। নেতাজির কল্পনাশক্তি, দূরদৃষ্টি ও সাহসের জন্যই এটা সম্ভব। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি দেশকে মুক্ত করার জন্য আত্মবলিদানের ঝুঁকি নিয়ে ওখানকার লোকেরা একটি সেনাবাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এর চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।

আচ্ছা একটু ভেবে দেখুন তো এই ভুলাভাই ১৯৩৮ সাল থেকেই অত্যন্ত প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা। আগে তো উনি সুভাষের সাহস ও দূরদৃষ্টি দেখতে পাননি। আসলে হাওয়া বুঝে কথা বলছেন। এই একই কারণে রেড ফোর্ট ট্রায়ালে তাঁরা আজাদ হিন্দ সেনানায়কদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার এর পাশাপাশি আর একটি উদ্দেশ্যও আছে। নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ সেনাদের ত্যাগ, সাহস যেমন সত্যি, তেমনি এটাও নাকি ঠিক ইংরেজরা নাকি এমনি-এমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার কথা ভেবেছে।

১৯৪৫ সালের ৫ নভেম্বর রেডফোর্ট ট্রায়াল শুরু। ঠিক পর দিন মানে ১৯৪৫ সালের ৬ নভেম্বর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ভারত বিষয়ক সচিব পেথিক লরেন্সকে গুরুত্বপূর্ণ লিখিত মতামত পাঠান।

.... ভারতের বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালানো হতে পারে। মানে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংগঠিত আঘাত। রেলপথ, টেলিগ্রাম অফিস, পুলিশ স্টেশন, সরকারি ভবন — সবকিছুই। উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে খুন হবে। আরও অনেক বড় আকারে আবার ১৯৪২ নেমে আসবে।

পেথিক লরেন্স এই নোটটি ক্যাবিনেটের ভারত ও বার্মা বিষয়ক কমিটির হাতে তুলে দেন। সঙ্গে মন্তব্য, 'বিষয়টির ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে সিভিল সার্ভিস এবং আর্মির ওপর'।

মনে রাখা দরকার ১৯৪০ সালে বালুচ বাহিনীকে নিয়ে প্রেমকুমার সায়গল যখন মালয়ের পথে রওনা হয়েছিলেন তখন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার সিংহভাগই ছিল পাঞ্জাবের অধিবাসী। তাদের মধ্যে শিখ, হিন্দু, মুসলমান থাকলেও কোনও ধর্মীয় বিভাজন ছিল না।

রোডফোর্ট ট্রায়াল শুরু হওয়ার আগেই পাঞ্জাবের তখনকার গভর্নর বার্ট্রান্ড গ্ল্যান্সি ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দেন। সায়গল, ধীলন, শাহনওয়াজ এখন প্রত্যেক পাঞ্জাবীর চোখে হিরো। ১৯৪৫ সালের ১৭ নভেম্বর লিখিতভাবে তিনি জানান, পাঞ্জাবী জনতা তিন আজাদ সেনা নায়কের বিরুদ্ধে আনা হত্যা ও হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিশ্বাস করে না। বিচারে তাদের দোষী প্রমাণ করে মৃত্যুদণ্ড দিলে এমন হিংসাত্মক আন্দোলন হবে যে তা ১৯১৯ সালের অমৃতসর দাঙ্গা এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়োকে ছাপিয়ে যাবে। রাজদ্রোহের অভিযোগ জনতাকে ক্ষিপ্ত করে



পেথিক লরেন্স।

তুলেছে। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি স্মরণকালের মধ্যে কখনও এতখানি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠেনি।

বোঝা যাচ্ছে ইংরেজদের এই ছুঁচো গেলা অবস্থা থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল প্রথমে কংগ্রেস। পরে মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা। কংগ্রেস ইংরেজরা যেমনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করল তা মেনে নিল। আর মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার আচরণে দাঙ্গাকারীরা উৎসাহ পেল। ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানের কথাটাই ভুলিয়ে দেওয়া হল। এমনকি নেতাজি সুভাষের অন্তর্ধানের প্রসঙ্গও।

ক্যালিফোর্নিয়া পাসাডোনার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ইতিহাসের অধ্যাপক পিটার ফে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে 'দি ফরগটন আর্মি' গ্রন্থটি লিখেছেন। গবেষণার স্বার্থে তিনি একাধিকবার ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। ..... ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শহরেই সুভাষ চন্দ্র বসু এভিনিউ বা নেতাজি মার্গ আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে কোনও রাস্তা আছে বলে শুনিনি। ওই সেনাবাহিনীর নামে কোনও ছুটি ঘোষণা হয়নি। ওদের জন্য কোনও আর্কাইভ নেই। নেতাজি ভবনে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর উদ্দেশ্যে কিছু স্মরণচিহ্ন আছে। লালকেল্লায় পর্যটকরা আলো ও ধ্বনি দিয়ে প্রস্তুত প্রদর্শনী দেখতে আসেন মুঘল দরবার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য। লালকেল্লার কোন ঘরে রেড ফোর্ট ট্রায়াল হয়েছিল তা জানার উপায় নেই।

যাক, কথায়-কথায় একটু অন্য জায়গায় চলে গেছি। কংগ্রেস সভাপতি হয়েই সুভাষ বলেছিলেন, সামনে বিশ্বযুদ্ধ। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনতে হবে। সুভাষ নতুন দল গড়ে, বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে ইংরেজদের আঘাত করলেন। তত দিনে কংগ্রেসের ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাই লেবার পার্টির ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে অন্য বার্তা দিল। বারোজনের সংসদীয় দল ভারতে পাঠাল। তারা বলল, ব্রিটেনের জনগণ চায়, যে ভারত তার পূর্ণ এবং অধিকার সম্মত ক্ষমতার বলে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দ্রুত উঠে আসুক।

এক দিকে যখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আজাদ হিন্দ সেনাদের লালকেল্লায় বিচার করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সাগরপাড়ের প্রাসাদে বসেও ঘুম নেই, আরেক দিকে আসল শত্রু নেতাজি সুভাষ ইউরোপে কোন ঘাঁটিতে লুকিয়ে আছে তা নিয়ে ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছে তারা। জার্মান, ইতালি, স্পেনে যাবে না। ইউরোপে আর কোন দেশ নেতাজি সুভাষকে ইংল্যান্ড-আমেরিকার শত্রুতা মেনে নিয়ে লুকিয়ে রাখার সাহস পাবে? হ্যাঁ, রাশিয়া। স্তালিন বড় বাড় বেড়েছে। সুভাষকে সামনে রেখে ভারতে ঢুকে পড়তে পারে। খবর যা, সুভাষও রাশিয়ার দিকেই গিয়েছেন।

সুদূর ভিয়েনায় এমিলি এক অদ্ভুত মানসিক শূন্যতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের যেটুকু খবর পেয়েছেন, তার কোনওটাই সুখের নয়। নেতাজি সুভাষ সম্পর্কে গোটা দুনিয়া যা জানে, তিনি তার চেয়ে বেশি জানেন না। বরং বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যুর খবর তিনি বিশ্বাস করেছেন।

এমিলিদের বাড়িটা তখন যেখানে, সেই এলাকা তখন রাশিয়ার দখলে। সেটা যখনই মনে হয়, এমিলির মনটা ভাল হয়ে যায়। তাহলে সুভাষ রাশিয়ার দিকে আসার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, রুশ শাসকদের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আর অনিতা, এমিলির সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটানো। অনেকটা জলাধারের ওপরে এসে মাছের বুদবুদ ছাড়ার মতো।

১৯৪৬ সালের গোড়ায় রুশ আধিকারিকদের একটি দল এমিলিদের বাড়ি তার চারপাশের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে গেল। কী কারণ, সে ব্যাপারে মুখ খুলল না। এমিলিদের এক আইরিশ পারিবারিক বন্ধু মিসেস উড। এমিলি লিখেছেন, তখন আমাদের খুব খারাপ সময় চলছে। খাওয়া জুটছে না। অনিতার দুধ জোটাতে পারিনি বেশ কয়েক সপ্তাহ। মিসেস উডের ধারণা চন্দ্র বোসের মৃত্যু সংবাদ সম্ভবত ঠিক নয়। এমিলি জানাচ্ছেন আমার কিন্তু ধারণা, চন্দ্র বোস মারাই গিয়েছেন। এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলে আমার চেয়ে বেশি আর কে খুশি হবে। অনিতার মুখের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রের মতো দিন কাটাচ্ছি। বিশেষ কারণে চন্দ্র বোসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও গোপন রেখেছি।

সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর ওপর মাউন্ট ব্যাটেনের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ সেনার কতটা আক্রোশ আছে তা সেই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে।

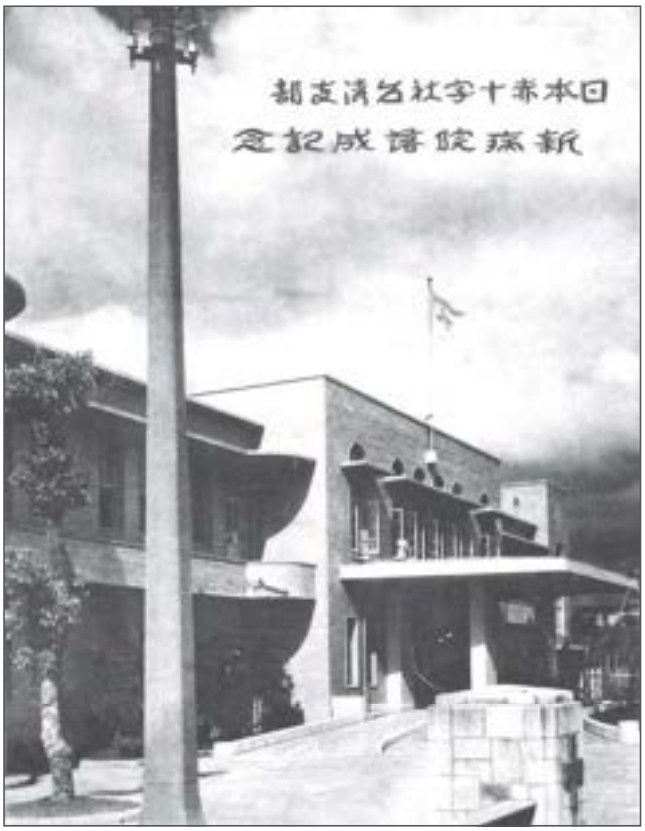
.... ১৯৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মাউন্টব্যাটেনের ব্রিটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুরে পৌঁছল। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আজাদ হিন্দ সেনা সিরিল জন স্ট্রেসির (Cyril John Stracey-র) করা প্রয়াত আজাদ সেনাদের উদ্দেশ্যে করা স্মৃতিসৌধ। নেতাজি সুভাষ নিজে স্ট্রেসিকে এই স্তম্ভ নির্মাণের জন্য বলেছিলেন। জামান কিয়ানী এই নির্মাণের তদারকি করেছিলেন। জামান কিয়ানীর হাতে আজাদ হিন্দ সরকারের দায়িত্ব দিয়ে নেতাজি সুভাষ সিঙ্গাপুর ছেড়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, সিঙ্গাপুরে পৌঁছনোর তিনদিন পর, মাউন্টব্যাটেনের সেনারা ডিনামাইট চার্জ করে আজাদ সেনার স্মৃতিস্তম্ভ উড়িয়ে দিল। সেখানে উপস্থিত এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আজাদ সেনারা অসহায়ভাবে তা দেখল। তাতেও রাগ মিটছে না। মাউন্টব্যাটেন তাঁর অধীনস্থ ব্রিটিশ সেনার তরফ থেকে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করায় সুভাষের শেষ পর্যন্ত কী হল তা জানার জন্য।



ডাঃ ইয়োসিন।

কর্ণেল জে জি ফিগেস (J G Figgess) অনুসন্ধান শুরু করলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সুপ্রিম কমান্ড অ্যালায়েড পাওয়ারের গোয়েন্দা বিভাগ। ১৯৪৬ সালে ২৫ আগস্ট তাদের রিপোর্টেও বলা হল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনাতেই সুভাষের মৃত্যু হয়েছে।

১৯৪৬ সালের ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন আলফ্রেড রেমন্ড টার্নার



জাপানের তাইপেই হাসপাতাল।

জাপানি সামরিক ডাক্তার ক্যাপ্টেন ইয়োসিনী তানেশির (Yoshini Taneyoshi) সাক্ষাৎকার নথিবদ্ধ করেছিলেন।

তাইপেই হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন সার্জেন তানেওযোশি ইয়োশিনি। তিনি জাপান বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ একজনকে নিয়ে এসে জাপানি মিলিটারি অফিসার যতদূর সম্ভব ভাল চিকিৎসা করে এই ভারতীয় বিপ্লবী চন্দ্র বোসকে বাঁচিয়ে দিন। তখনও ওই অগ্নিদগ্ধ রোগী কথা বলতে পারছেন। জাপানি ভাষায় জল চায়। জলের জাপানি প্রতিশব্দ Meju.

গবেষকরা বলেন, উনি হয়তো শরৎ বোসকে বিপদের সময়ে মেজদা বলে ডাকতে চেয়েছিলেন।

ডাক্তারের বক্তব্য, আগত অগ্নিদগ্ধ সেই পেশেন্টকে নিজে হাতে কাপে করে জল খাইয়েছেন। দোভাষীর জন্য আবেদন করায় নাকামুরা (Nakamura) নামে এক সরকারি অফিসারকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, চন্দ্র বোসের জন্য এর আগেও দোভাষীর কাজ করেছেন। তিনি চন্দ্র বোস সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। তাতে আমার কোনও সন্দেহ হয়নি যে এক আহত ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে বিভ্রান্ত করছে। ঘন্টা চারেক পর ব্যক্তির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করল। এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারই সঙ্গে আর এক সেনানায়ককে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল। তার অবস্থা অবশ্য কখনওই তেমন খারাপ ছিল না। তিনিও চন্দ্র বোস সম্পর্কে প্রথম থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে এই সামরিক অফিসার আর কেউ নন, হাবিবুর রহমান।

ডাঃ ইয়োসিনী জানিয়েছেন, প্রথমে ঠিক ছিল চন্দ্র বোসের দেহ টোকিওতে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই দেহতে ফরমালিন ইনজেক্ট করা হল। কফিনে খানিকটা চুলও দেওয়া হল। ১৯৪৫ সালের ২০ আগস্ট এই দেহ নিয়ে টোকিওগামী বিমান ধরার জন্য বিমানবন্দরে গেছিল। কিছুক্ষণ বাদে আবার হাসপাতালে ইয়োসিনীর কাছে ফিরে এল। নানা রকম সমস্যা। দেহ এখানেই দাহ করতে হবে। তাই হল। চন্দ্র বোসের চিতাভস্ম নিয়ে হাবিবুর রহমান ফিরে চললেন টোকিওর দিকে।

অনেক দিন আগের কথা। তখন গান্ধীর পছন্দের প্রার্থী সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গোটা দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ঘটনাটা ব্রিটিশদের হারানোর মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভে এক রাতে সুভাষ হাঁটছেন। পাশে নাথানাল পারেখ। হঠাৎ ওপরে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সুভাষ বললেন, মানুষ তো একদিন না একদিন মারা যাবেই। কিন্তু আমি কেমন মৃত্যু চাই জানেন? আকাশে উড়তে-উড়তে অনেক ওপরে চলে যাব, ওই তারাদের কাছে তারপর হঠাৎ বিমান ধ্বংসের পর মাটিতে নেমে আসবে আমার দেহ।

নিশ্চিত পরাজয় ও লজ্জা এড়াতে হিটলার বাঙ্কারে বসে আত্মহত্যা করেছিলেন। তাহলে কি নিশ্চিত বিপদ জেনেও ঝুঁকিপূর্ণ বিমানযাত্রা বেছে নিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ? এমন প্রশ্নও কেউ-কেউ তুলেছেন। কিন্তু যে বিমান দুর্ঘটনা হয়নি, সেটাকে সামনে রেখে এমন প্রচার ও পাল্টা প্রচার কেন হয়ে চলেছে!

তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ জওহরলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধীর মনে বরাবরই ছিল।

১৯৫১ সালে এস এ আয়ারকে জাপানে পাঠান নেহরু এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। আয়ার দীর্ঘদিন আজাদ হিন্দ সরকারে নেতাজির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জাপানি কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এখন তিনি স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি। গুরুত্ব ও মর্যাদা বেশি। শেষ যাত্রায় নেতাজির সঙ্গে যে ৬ জন জাপানি সেনানায়ক বিমানে ছিলেন, তাদের মধ্যে ২ জন তখনও বেঁচে। আয়ার তাঁদের সঙ্গে টোকিওতে কথা বলেন।

১৯৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরে আয়ার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একটি রিপোর্ট দিলেন। তাতে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে হাবিবুর রহমানের বক্তব্যকে জীবিত দুই সেনানায়ক কর্ণেল নোনোগাকি (Nonogaki) এবং ক্যাপ্টেন আরাই (Arai) সমর্থন করেছেন বলে জানালেন।



লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই রিপোর্ট ১৯৫২ সালে পার্লামেন্টে পেশ করলেন। দেশবাসী তারপরও প্রবলভাবে বলতে লাগল নেতাজি বেঁচে আছেন। তাঁকে ঠিক খোঁজা হচ্ছে না।

ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসকের হেডকোয়ার্টারে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল। ব্রিটিশ শাসক এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ শাসনের জ্বলন্ত প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেন যাঁকে জীবিত ও মৃত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র।

১৯৫৬ সালে একদা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ভারতে এসে তখনকার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, আমরা ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছি নেতাজি সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ সেনার জন্য। ভারতের সেনার ভরসাতেই ভারত শাসন করতাম। বোঝা গেল, সেই ভারতীয়

সেনাদেরই নেতাজি সুভাষ আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। যত দিন যাবে এই মনোভাব অন্য ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর কথার প্রমাণ, ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহ।

আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের মধ্যবর্তী মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার মুহূর্তে জওহরলাল নেহরুর সূচনা ভাষণে কিংবা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণের অনুসারী ভাষণে একবারের জন্যও নেতাজি সুভাষ বা আজাদ হিন্দ সেনার কথা বলা হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভাইপো বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জি সেই রাতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে। তাঁর কাছে এমন শুনেছি।

এই ঘটনায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পর দিন জওহরলাল লালকেল্লা থেকে যে ভাষণ দেন তাতে আজাদ হিন্দের অবস্থান ও নেতাজির ব্যাপারে কিছু বলেন।

''আজ আমরা আমাদের যা হারিয়ে গিয়েছিল, তা ফিরে পাওয়ার জন্য এই প্রাচীন কেল্লায় এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে একত্রিত হয়েছি। এই পতাকা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা কংগ্রেসের বিজয়ের প্রতীক নয়। বরং একটি সমগ্র ভারতবর্ষের বিজয়ের প্রতীক।

আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন। আজকের এই দিনে আমাদের অবশ্যই সেই সকল মানুষদের স্মরণ করতে হবে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। সবার নাম আলাদা করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি সুভাষ চন্দ্র বোসের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। যিনি বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন। তিনি বিদেশের মাটিতে এই পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এবং লালকেল্লায় যেদিন এটি ওড়ানোর দিন এল আফসোস, সেই স্বপ্নপূরণ হতে দেখার জন্য তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। আজ তাঁর ফিরে আসার দিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি আর পৃথিবীতে নেই।

এই দীর্ঘ ভাষণের একটি পোষাকী নাম ছিল 'দি অনার অফ দি ফ্ল্যাগ'। আসল কথা ১৪ ও ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে নেহরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, যার নাম 'ট্রিট উইথ ডেস্টিনি'। হিন্দুস্তানী ভাষায় দেওয়া এই ভাষণ মনে করিয়ে দেয়, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সুভাষ বলেছিলেন ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দুস্তানী হওয়া উচিত।

প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। তিনি কেন এবং কোন প্রমাণের ভিত্তিতে বললেন, সুভাষ আর এই পৃথিবীতে নেই। তাঁর নিজেরও তো সংশয় ছিল। তাহলে কি তিনি জানতেন, সুভাষ কোথাও কোন দুর্ঘটনা বা আঘাতে মারা গেছেন।



লালকেলল্লায় ভাষণরত।

আর একটা কথা। তিনি যদি সুভাষের অবদানকে এতটাই গুরুত্ব দেন তাহলে তাঁর জীবদ্দশায় পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে সুভাষের পূর্ণাবয়ব ছবি স্থান পেল না কেন? এটা ঠিক সে দিন তাঁর ভাষণে সুভাষ ও গান্ধী ছাড়া



পার্লামেন্টে নেহরু।

কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী আলাদা করে স্থান পায়নি। এমনকি ভগৎ সিং, চিত্তরঞ্জন দাসও না।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট গণপরিষদ কক্ষের দেওয়াল সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল। ১৩ দিন পর মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্র টাঙানো হয়। ১৯৫৭ সালের মে মাসে দাদাভাই নওরোজি, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়ের এবং ডিসেম্বরের চিত্তরঞ্জন, মদনমোহন মালব্য, বল্লভভাই প্যাটেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি টাঙানো হয়। ১৯৭৮ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষের তৈলচিত্র জনতা সরকারের আমলে সেন্ট্রাল হলে টাঙানো হয়। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার সময় ভাষণরত সুভাষকে তুলির টানে তুলে ধরেন চিত্রশিল্পী চিন্তামনি কর। তৎকালীন সাংসদ সমর গুহ লেগে না থাকলে মোরারজি দেশাই, অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার এটা করত কিনা সন্দেহ! ১৯৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি সংসদ ভবনে নেতাজির বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হয়। ২০০৮ সালের ১৫ আগস্ট নেতাজির পাশে ভগৎ সিং-এর মূর্তি বসানো হয় সংসদ ভবনে। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত পুরনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে বোমা নিক্ষেপ করেন। পার্লামেন্ট স্ট্রিটের কো-আপ সোসাইটি কমপ্লেক্সের ভেতরে ভগত সিং, রাজগুরু, সুখদেবের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়।

ইতিহাসের কী বিচিত্র পরিহাস, যাঁরা এক সময়ে নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস সভাপতি সুভাষকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেননি, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, যা একসময়ে জার্মান ও জাপানের তল্পিবাহক বলে সুভাষকে অপমান করেছেন, দেশে ফিরলে সর্বতোভাবে বাধা দেবেন বলেছিলেন, তাঁরাই স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সুভাষকে তুলে ধরলেন। আবার তাঁরাই আজাদ হিন্দ সেনাদের সরকারি চাকরি ফিরিয়ে দিলেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি ও পেনশন সেনাদের দিলেন না।

বার্মা ফ্রন্টে তখন প্রবল যুদ্ধ চলছে। নানাভাবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আজাদ সেনাদের উৎসাহিত করে স্ট্র্যাটেজি বুঝিয়ে তাঁবুতে ফিরতেন সুভাষ। বেশিরভাগ সময়ে সঙ্গী প্রেমকুমার সায়গল। তখনও সুভাষের ক্লান্তি নেই। দেশ, বিদেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে সুভাষ অনর্গল বলে যেতেন। মুগ্ধ শ্রোতা প্রেম সায়গল। ... প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জার্মান হেরেছিল, তখনও হিটলার, মুসোলিনী কী ভুল করেছে — এসব নিয়ে। কথা হতো গান্ধী, নেহরু কত বড় নেতা, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা কী করেছেন, কতদূর সফল! সবশেষে সতর্কবাণী জয়ী ব্রিটিশ যদি ভারতের স্বাধীনতা দেয়, হিন্দু-মুসলমান বিভাজন ঘটাবেনই। ■

(আগামী ডিসেম্বর সংখ্যায়)

দূরপাল্লার বাসে, ট্রেনে সিসিটিভি লাগানো জরুরি হয়ে পড়েছে

তপতী মজুমদার



সিসিটিভি ট্রেনে।

একটা বড় বিপদের হাত থেকে একটা ফোন নাম্বার কীভাবে বাঁচাল একজনকে আজ তারই ঘটনা জানাব সবাইকে। অনুরোধ করব কোনও স্বল্প পরিচিত লোকের থেকে রাস্তাঘাটে কিছু না খেতে। সে জল হোক বা চা কিংবা বিস্কুট। দুষ্টলোকের অভাব নেই, যেভাবে রাস্তাঘাটে লোক ঠকানো হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তার শিকার হচ্ছে। তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর সব দূরপাল্লার বাসে, ট্রেনে সিসি টিভি লাগানোর ব্যবস্থা হোক। এতে অনেক সমস্যা থেকেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

আমার এক আত্মীয় প্রত্যেক সপ্তাহের মতোই ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন সকাল ছ'টায় নিজের ব্যবসার কাজে। দীর্ঘ দিন উনি ধর্মতলা থেকে বাস ধরে মেদিনীপুর যান। সেই দিন হঠাৎ সকাল ন'টার পর ওনাকে আর ফোনে পাওয়া যায় না। যতবার তাঁর স্ত্রী ফোন করছেন ফোন সুইচ অফ বলছে। সকাল সাড়ে দশটায় ওনার মেয়ে আমার বৌমার কাছে ফোন আসে। বলছে আপনার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। অবস্থা ভাল না। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন। উনি ওই বাসের কন্ডাক্টর। বললেন, ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আমরা সকলে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওনার কোনও দিন সুগার, প্রেশার কিছুই ছিল না। হঠাৎ কি এমন হল যে অবস্থা ভাল না বলছে। অথচ ভাল মানুষটি ঘর থেকে একটু খাওয়া-দাওয়া করেই বেরিয়েছিলেন।

আমার ছেলে-বৌমা সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে।



বাসে সিসিটিভি।

গাড়িতে যেতে-যেতে কন্ডাক্টর দাদার সঙ্গে কথা হয়। যেখানে নামার কথা সেখানে না নামতে দেখে কন্ডাক্টর দাদা ওনাকে ডাকতে গিয়ে দেখেন কোনও জ্ঞান নেই। বাসটি সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিয়ে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন। ড্রাইভার দাদাকে অনেক ধন্যবাদ যে উনি বাসকে ঘুরিয়ে নিয়ে আত্মীয়টিকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তখন আত্মীয়র কাছে টাকা-পয়সা, হাতে সোনার আংটি, ঘড়ি, মোবাইল ফোন কিছুই ছিল না। ওগুলো অপরাধীরা বাসেই নিয়ে নিয়েছে। শুধু একটা ব্যাগ ছিল তাঁর হাতে, তার গায়ে ছিল ফোন নাম্বার। ওই নাম্বারটা ধরেই যোগাযোগ করে। ভাগ্যিস ব্যাগটা নেয়নি। ফোন নাম্বারটা ছিল বলেই মানুষটার সঙ্গে আবার তাঁর বাড়ির লোক তাঁকে অন্তত ফিরে পেয়েছে।

প্রথমে অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ভেন্টিলেশনে ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন এবং ওনার ব্যবসার লোকজনেরাও আসেন। ছেলে-বৌমার পাশে সারাক্ষণ ওনারা ছিলেন। কলকাতার বড় হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলতে হাসপাতালের ডাক্তাররা বললেন ভেন্টিলেশন থেকে এখনই বার করা যাবে না, উনি এতটাই খারাপ আছেন। রাত সাড়ে দশটার পর ওনারা ছাড়লেন ভেন্টিলেশনযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স। প্রায় রাত দেড়টার সময় কলকাতা সিএমআরআই-তে অ্যাডমিট করা হয়, তখনও কোনও জ্ঞান নেই। এভাবেই তিন দিন কেটে যায়। চতুর্থ দিনে জ্ঞান ফিরল। উঠে আস্তে-আস্তে কথা বলেন। তখন বললেন দুটো ছেলে স্বল্প পরিচিত, নিয়মিত যাবার পথে একটু মুখ চেনা, তাদের কাছে খুচরো টাকা না থাকায় ওদের দুটো টিকিট কাটতে বলে। পরে দিয়েছে ঠিকই, তবে মনে হয় টাকার সঙ্গে কিছু লাগিয়ে দিয়েছে। উনি তাতেই হিপনোটাইজড হয়ে গেছেন। ছেলে দুটো ওনাকে দুটো বিস্কুট খেতে দিয়েছে। খেতে ভাল লাগছিল না কিন্তু বাধ্য ছেলের মতো খেয়ে নেবার পর আর কিছুই মনে নেই।

আজ পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই ধরতে পারেনি। আমরা ভেবেছিলাম, সরকার পাল্টেছে, থানা-পুলিশ বদলেছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। থানায় অনেক ঘোরাঘুরি করেও লাভ হয়নি। এ থানা বলে ও থানা ও থানা বলে সে থানা। এই কর্মব্যস্ত জীবনে এত কার সময় আছে যে কলকাতা থেকে মেদিনীপুর রোজ থানায় যাওয়ার। সরকারের কাছে অনুরোধ করছি থানা-পুলিশ আর একটু মানবিক হলে আমরা সাধারণ মানুষ একটু ভরসা পাই।

ধন্যবাদ অবশ্যই ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর দাদাকে হাসপাতালে দ্রুত ভর্তি করিয়ে দেবার জন্য। সময়মতো আইসিসিইউ এবং ভেন্টিলেশন পেয়েছিলেন বলেই উনি তাঁর প্রিয় মানুষজনের কাছে ফেরত আসতে পেরেছেন। কয়েক মাস হয়ে গেল, এখনও উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। ঠিক কি হয়েছিল আজও অজানা।

ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। আর পুলিশ শাস্তি না দিলেও ছেলে দুটোকে যেন ঈশ্বর ক্ষমা না করেন। ■

আলিয়া ভাটের মতো অনেকেই এই মানসিক রোগের শিকার হতে পারেন, কিন্তু কেন?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক



বর্তমানে মানসিক রোগ নিয়ে ছুঁৎমার্গ অনেকটাই কমেছে। তারকারা নিজেরাই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ করে এক্স-হ্যান্ডেলে নিজেদের নানা সময়ের মানসিক যন্ত্রণার কথা শেয়ার করছেন। এই যেমন আলিয়া ভাট কাপুরের কথাই ধরা যাক। কয়েক দিন আগে জানিয়েছেন তিনি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডারের শিকার। দীপিকা পাড়ুকোন আগেই জানিয়েছেন একটা সময়ে তিনি তীব্র অবসাদে চলে গিয়েছিলেন।

রোগটি কী?

অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার সংক্ষেপে এডিএইচডি হল এক ধরনের রোগ, যার ফলে চঞ্চলতার চেয়ে মনোযোগহীনতার তীব্রতা বেশি থাকে। অ্যাটেনশন ডেফিসিট বাংলা করলে দাঁড়ায় মনোযোগহীনতার খামতি। বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা দিলেও বড়দের যে একদম হবে না, তা বলা যায় না। শিশুদের ক্ষেত্রে যখন মনোযোগহীনতার সমস্যা শুরু হয়, তখন তারা স্কুলের ব্যাগ গোছানো, খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে দৈনন্দিন সব কাজেই মনোযোগহীতার পরিচয় দিতে থাকে। কোনও কাজই গুছিয়ে ঠিকভাবে করে উঠতে পারে না। সাধারণত ছোট বয়সেই এই রোগ শনাক্ত করা যায়। মা-বাবা বা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুর বদলে যাওয়া আচরণ লক্ষ্য করেন, তারপরেই তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে রোগটি আছে কি না তা শনাক্ত হয়।



কী-কী লক্ষণ দেখে বুঝবেন

এই রোগের বেশ কয়েকটি চেনাজানা উপসর্গ থাকে, যার মধ্যে আছে ঃ

কোনও কিছুর প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে না পারা। সারাক্ষণ অস্থির ভাব।

চিন্তাভাবনা না করেই কোনও কিছু আচমকা ঠিক করে ফেলা।

স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতেও সমস্যা হয়।

বই-খাতা, পেন সহ রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিস প্রায়ই হারিয়ে ফেলা।

লাফিয়ে উঁচুতে উঠতে যাওয়া।

প্রশ্ন শেষের আগেই জবাব দেওয়া।

পড়াশোনা হোক বা খেলাধুলো কোনও কিছুতেই মনোসংযোগ করতে সমস্যা হওয়া।

বড়দের কাজ বা কথার মধ্যে সব সময়ে বাধা দিয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চায়।

একসঙ্গে অনেক কিছু করতে চায়, তবে সবশেষে কোনও কাজই ঠিকমতো করে উঠতে পারে না।

অনেক সময় মনে হয় তারা আশপাশের মানুষের কথা শুনছে না।

বারবার এক জিনিস পড়া সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। তবে মনে রাখবেন যে কোনও মনোযোগহীনতা মানেই এডিএইচডি নয়।

যদি একটানা কমপক্ষে ছয়মাস এই মনোযোগহীনতার সমস্যা থাকে তখন তাকে এডিএইচডি বা এডিডি (অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার) বলা চলে। তবে বড়দের থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোটবেলাতেই এই সকল লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

কেন হয় রোগটি?

এই সমস্যার আজ পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনি। তবে সম্ভাব্য কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

রোগটি জিনবাহিত, পরিবারে কারও যদি এই রোগ হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা আসতে পারে।

জন্মের সময়ে বা জন্মের পরে পরেই শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত থেকে এই রোগ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় কোনও মহিলা যদি এমন পরিবেশে বসবাস করেন যেখানকার বাতাসে তা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁর গর্ভে গিয়ে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করতে পারে যার ফলে পরবর্তীতে বাচ্চার এডিএইচডি হতে পারে।

যে সকল বাচ্চা সময়ের আগে জন্মায়, তাদের এই সমস্যা থাকতে পারে।

জন্মের সময় শিশুর ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম থাকলে রোগটি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভাবস্থায় মা যদি ধূমপান বা মদ্যপান করে সেখান থেকে বাচ্চার ক্ষতি হয়। আলিয়া ভাটের ক্ষেত্রে এটাই প্রধান কারণ।

কীভাবে মিলবে প্রতিকার?

দীর্ঘদিন ধরে কারও মধ্যে তা সে বাচ্চা, বড় যেই হোক না কেন মনোযোগহীনতার সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের কাছে যান।

নিজের জন্য একটি রুটিন তৈরি করুন এবং বাড়ির সকলে যাতে সেই রুটিন মেনে চলে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। তাতে বাচ্চার খেলা ও খাওয়া এবং অবশ্যই পড়ার জন্য পৃথক-পৃথক সময় বাছুন।

বাচ্চার তরফ থেকে বারেবারে কোনও ইশারা আসলে সেটিকে বোঝার চেষ্টা করুন।

খাদ্যতালিকায় প্রক্রিয়াজাত খাবার, টেট্রাপ্যাকের জ্যুস কমিয়ে তাজা ফল ও শাকসবজি রাখুন।

বড়দের যদি কাজ করতে সমস্যা হয়, এত দিনকার চেনা কাজের ছন্দটা পালটে যায়, বাড়িতে কোনও কাজ গুছিয়ে করতে পারছেন না, সব জায়গাতেই অস্থির লাগছে, কোথাও মনোযোগ দিয়ে বসতে পারছেন না — এ রকম সমস্যা হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে যান। ■

হোমিওপ্যাথি প্রশিক্ষণ
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম.ডি (হোমিও)
একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হোমিও চিকিৎসক। তিনি একটি স্বকীয় ধারায় চিকিৎসা করেন যার নাম 'মল্লিক মেথড'। যদি এ বিষয়ে কোনো হোমিওচিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিতে চান, তবে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
ডাঃ পি. মল্লিক
প্রথমেক্ষ ঃ মল্লিক হোমিও হল
৮৮/১, নামনম রোড (নেমনম কুইন সিনেমা-হোরাগাছা), কলকাতা-৩০
ফোন ঃ ২৮৩০০২৫৮৭/২৮৩০৫০২৫৪৩

পথে-পথে পথের সুরে

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

তুলসী তলায় পিদিম জ্বেলে/শুরু হবে পথের কথা। আমাদের ভ্রমণকথা একটু আলাদা। বিগত আড়াই দশক ধরে বছরের শুরুতেই স্থান নির্বাচন ও সময় পর্ব ঠিক করে নেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে বাংলার কোনও জেলার পুজো দেখা, জেলার রসনাস্বাদন সঙ্গে দর্শনীয় জায়গাগুলোর পরিক্রমণ। কালীপুজোয় সপ্তাহকাল বাংলার বাইরে। ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ চষে ফেলা গেছে। প্রকৃতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস কত যে রত্নাবলির সন্ধান পেয়েছি, নয়ন-মন তৃপ্তিলাভ করেছে। তবে এই সময়কালে ঘরের বাইরে থাকার বড় কারণ বাড়ির জানলার নিচে কালীপুজো। সপ্তাহ ভোর ডিজে, বক্স, মাইকের 'অমায়িক' আচরণে প্রাণ ওষ্ঠাগত। শব্দের হাতুড়িতে প্রাণ বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এই শব্দাসুরের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ঘরে তালা মেরে বিসর্জনের বাজনা বাজার পর ঘরে ফেরা। মনের আরাম, শরীরের বিরাম সঙ্গে উপরি পাওনা ভারতদর্শন। অপ্রাপ্তির ব্যথা দিদি থাকা সত্ত্বেও ভাইফোঁটা থেকে বঞ্চিত হওয়া।



রাজমাহেন্দ্রীর মার্কণ্ডেয় স্বামীর মন্দির।

গত বছর আমরা গিয়েছিলাম অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু জনপদ। সলতে পাকানো, ধূপদান, শঙ্খনাদ শুনিয়ে আসি আসল কথায়। শ্যামাপুজোর দিন বেলা ৩.১০ মি-এর করমন্ডল এক্সপ্রেসে রাজামুন্দ্রির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। দীপাবলির সন্ধ্যায় মাঝে-মাঝে আলোক সজ্জা চোখে পড়ছিল। আমাদের এবারের যাত্রায় সিট ভাল হয়নি। তিনজন তিন জায়গায়, একটাই লোয়ার বার্থ। রাতে প্যান্ট্রি কারের খাবারের মানও খুব খারাপ ছিল। যাত্রার শুরুতেই মন্দ লাগা। এক ঘন্টার বেশি সময় দেরি করে ট্রেন সকাল ৮.৪৫ মি. নাগাদ রাজামুন্দ্রি স্টেশনে পৌঁছাল। স্টেশনের বাইরে অটো স্ট্যান্ড। আমরা অটোতে করে (১৫০ টাকা ভাড়া) আগে থেকে বুক করা হোটেল আদিত্য প্যালেসে পৌঁছালাম। হোটেল, রুম ব্যবস্থাপনা দেখে গত রাতের মন খারাপটা কেটে গেল। পাঁচ দিনের ট্যুর অনেকখানি এলাকা ঘুরতে হবে, সুতরাং নো বিশ্রাম। স্নান সেরে বেড়িয়ে পড়তে হবে। ধোসা, কফি টিফিন করে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম রাজামুন্দ্রির আশেপাশে দর্শনীয় সব দেখে নিতে।

রাজমাহেন্দ্রী বা রাজামুন্দ্রি গোদাবরী (যা দক্ষিণের গঙ্গা নামে পরিচিত) নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত এক প্রাচীন নগরী। তবে এই পবিত্র নগরী প্রাচীন, আধুনিকতা সবকেই ঠাঁই দিয়েছে। চালুক্য রাজ মহেন্দ্রের নামেই এই জনপদের নামকরণ করা হয়েছিল রাজমাহেন্দ্রী। সময়ের ধারায় তা এসে দাঁড়ায় রাজমুন্দ্রিতে। ইতিহাসের নানান পট পরিবর্তনের সাক্ষী এই প্রাচীন জনপদ। চালুক্য বংশের পর দক্ষিণী-ইসলাম শাসক তারপর ওড়িশ রাজ, শেষ পর্যন্ত পালাবদলে ফরাসী আর ইংরেজরা। শহরের মূল অংশ থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সংস্কৃতি, বাণিজ্যনগরী রাজামুন্দ্রির আধ্যাত্মিক পরিবেশ স্মরণীয়। অজস্র মন্দির রাজামুন্দ্রিতে। ঝকঝকে রাস্তায় গোদাবরীর পাড় ধরে উপস্থিত হলাম নদীর কিনারায় মার্কণ্ডেয় স্বামীর মন্দিরে। এখানে হরপার্বতী, নারায়ণ সূর্যদেবতা। এই মন্দিরে দান-ধ্যান করলে নাকি পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরাণের বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি এখানে রয়েছে। রয়েছে রাম-সীতা মন্দির। গোদাবরীর দুই প্রসিদ্ধ পুষ্করঘাট ও কোটি লিঙ্গেশ্বর ঘাটের পরিবেশ পবিত্র। কোটি লিঙ্গেশ্বর ঘাটে কোটি লিঙ্গেশ্বর মন্দিরটি প্রাচীন ও দ্রাবিড় শিল্পরীতির নিদর্শন। পুষ্কর ঘাটে ১২ বছর অন্তর-অন্তর হয় পুষ্করম উৎসব। মহর্ষি গৌতমী দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য যজ্ঞের আয়োজন পুরাণ কথাকে স্মরণে উৎসব। পুষ্করঘাটে মদুগাই মুখ্যদেবতা, স্বয়ং শ্রীশ্রী সারদাদেবী এখানে এসেছিলেন। গোদাবরী বুকে একটু ভেসে বেড়ানোর জন্য নৌকা রয়েছে। গোদাবরীর বুকে রয়েছে ভারতের দীর্ঘতম রেলসেতু ৫৬টি স্তম্ভ সন্ধ্যায় আলোর বর্ণমালায় এক অপরূপ রূপ নেয়। প্রায় দুটো নাগাদ মধ্যাহ্নভোজন নিরামিষ সম্পূর্ণ দক্ষিণী (তেলেগু) পদে।

হোটেলে ঘন্টা দেড়েক বিশ্রাম নিয়ে চারটের সময় ফের বের হলাম গোবাবরী ব্যারেজ বা কটন ব্যারেজ। সপ্ত ধারায় রয়েছে গোদাবরীর জলস্রোত। বশিষ্ঠ ও গৌতমী নদীর মাঝে র‍্যালিতে জগনমোহন কেশব স্বামী মন্দির, সমালকোটে ১০ম শতকের চালুক্য মন্দির ফেরার পথে আর্থার কটন মিউজিয়ামে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার গোদবরী নদীর ঘাটে 'সন্ধ্যারতি' দেখার জন্য। ইতিপূর্বে বেনারসে সন্ধ্যারতি দেখেছি। এখানে সেরকম ভিড় না হলেও সান বাঁধানে ঘাটে বসে প্রায় ঘন্টাখানেকের আরতি দেখলাম, মনটা ভরে গেল। আরতি পর্ব সেরে ইসকন মন্দির ও রঙ্গনাথস্বামী মন্দির দর্শন করে হোটেলের পথে। প্রথম দিনে ট্যুর প্যাক আপ।

দ্বিতীয় দিনে আমাদের গন্তব্য পাপিকোন্ডালু। সারা দিন ধরে গোদাবরী নদীতে বিলাসবহুল লঞ্চে ভেসে বেড়ানো। সারা দিনের এই জলসফর রোমাঞ্চকর ও আরামদায়ক। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বেড়িয়ে প্রায় ৩০ কিমি দূরের পত্তিসীমায়। এখান থেকে এসি লঞ্চে সারা দিনের ভ্রমণপর্ব। রাজামুন্দ্রি থেকে জনপথ, বিজন, অরণ্য, দূরে গ্রাম, পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পথ পেড়িয়ে ন'টা নাগাদ পৌঁছালাম। পরিচয়পত্র দেখিয়ে লঞ্চে উঠলাম। প্রথমে প্রাতঃরাশ ও কফি পরিবেশন করা হল। এ পর্ব মিটতেই ডেকে চেয়ার পাতা আছে, সঙ্গে লাইফ জ্যাকেট। প্রায় দশ ঘন্টার এই জলপথ ভ্রমণ যাতে বোরিং না লাগে তাই ধারাভাষ্য, সঙ্গীত, ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে কথোপকথন, কিছু আমোদমূলক নাচ-গান পরিবেশন করা হয়। মাঝে এসি কেবিনে মধ্যাহ্নভোজন, বিকেলে চা-বিস্কুট পরিবেশন। একাধারে পবিত্র গোদাবরী নদী, তার জলধারা, পাহাড়, জঙ্গল, দূরে বিচ্ছিন্নভাবে আদিবাসী গ্রাম আর প্রকৃতির কী এক অনবদ্য রূপ।



গোদাবরী ব্যারেজ।

সকাল ৯.৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু হল। দু'চোখ জুড়িয়ে যায় গোদাবরীর দু'পাশের শোভায়। শুধু জল আর জল তবে দেখে চিত্ত হয় না বিফল। পূর্বঘাট পর্বতমালা, গোদাবরী নদীর অববাহিকা, স্থানীয় সংস্কৃতি, গিরিখাত, পৌরাণিক মহাকাব্য, রামায়ণের আখ্যান, গৌতমী মুণির কথা, জনজাতির ইতিহাস — সব মিলিয়ে পাপিকোন্ডালু দর্শন অভিজ্ঞতার রাশি কথা। যারা ভদ্রাচলমে যাবে তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে লঞ্চ এসে নোঙর করে পেরেন্টাপল্লীতে। নদীর ছোট্ট আদিবাসী গাঁ। রামকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। মন্দিরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ওঁ-এর মধ্যে অপূর্ব মূর্তি। সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীকচিহ্ন। পাশেই বয়ে চলেছে ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্ণা। এক আশ্চর্যরকম নীরবতা। সৌরবিদ্যুতের

ব্যবহার এখানে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতের কাজ বিক্রির স্টল রয়েছে।

এবার ফেরার পালা। নদীর বুকে সূর্যাস্ত রক্তরাগে মন রাঙিয়ে দেয়। লঞ্চ যখন পাড়ে এসে ভিড়ল নদীর চারপাশে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারের বুক চিরে সেই একই রাস্তায় ফেরা। পথ চলতে বৃষ্টি, হাওয়া দুই-ই সঙ্গী হল। রাত প্রায় দশটা নাগাদ আদিত্য প্যালেসে এসে পৌঁছালাম। রাতের আহার সেরেই ঘুম, কেননা সকালে তৃতীয় দিনের সফর।



কনকদুর্গা মন্দির।

তৃতীয় দিনের যাত্রা। আবহাওয়া দপ্তরের খবর ছিল অন্ধ্র-উপকূলে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখা গেল রাজামুন্দ্রির আকাশ পরিষ্কার। আজকের যাত্রাপথ প্রায় ১৬০ কিমি দূরের বিজয়ওয়াড়া। সকাল-সকাল স্নান সেরে সড়ক পথে বিজয়ওয়াড়ার পথে। রাজামুন্দ্রি থেকে বিজয়ওয়াড়া। পথের একটা বড় অংশ জাতীয় সড়কে। সত্যি কথা বলতে এত ভাল রাস্তায় যাত্রা আরামদায়ক ও তৃপ্তিদায়ক। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর আকাশের মুখ ভার, আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। পথেই শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ছাতা মাথায় আছে, কিন্তু বৃষ্টি মাথায় যা দেখতে এসেছি তা সম্ভব হবে কি?

বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইতিহাস আর আধুনিকতার মিলনকেন্দ্র। লোকশ্রুতি অনুসারে মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাকি এখানে তপস্যা করে মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করেন। জায়গাটির নাম হয় 'বিজয় বাটিকা' যা সময়ান্তরে বিজয়ওয়াড়া। একদা এই অঞ্চলে রাজত্ব ছিল চালুক্য রাজবংশের। ইতিহাসের নানান অধ্যায় পেরিয়ে একদিকে কৃষ্ণানদী, অন্যদিকে পাহাড়ের মাঝে এই শহরের অবস্থান। আমাদের গাড়ি প্রথমেই এসে থামল প্রকাশম ব্যারেজের কাছে। ব্যারেজের ওপর গাড়ি থামানো নিষিদ্ধ, ফলে গাড়ি স্লো করা হল। আমরা ব্যারাজের ওপর দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা নদীর রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। বিশাল জলরাশি, চারপাশ থেকে ভেসে আসছে 'মন্ত্রস্তুতি' একটা ভিন্ন পরিবেশ। বৃষ্টি থেমে গেছে, রাস্তায় ভিড় গাড়ি আর মানুষের। কৃষ্ণা নদীর তীরে ইন্দ্রকিলাদ্রি পাহাড়ে রয়েছে কনকদুর্গা মন্দির। মন্দির কর্তৃপক্ষের বাস মন্দিরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ভাড়া ১০ টাকা। প্রথমবার বাসে চেপে মন্দিরের প্রবেশদ্বার থেকে ফিরে এলাম। ভীষণ ভিড়। কার্ত্তিক মাস এখানে লদী মাস। মন্দিরে-মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। নিচে নেমে এসে গাড়ি নিয়ে পৌঁছলাম কৃষ্ণানদীর তীরে। এখান থেকে পর্যটন দপ্তরের লঞ্চে চেপে ভবানী আইল্যান্ডে কৃষ্ণা নদীর বুকে গড়ে ওঠা চরে। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি, সঙ্গে হাওয়া আইল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে বাধা হচ্ছিল। তবে অবশ্যই দ্রষ্টব্য এই দৃষ্টিনন্দন স্থানটি।



কোন্ডাপল্লি শিল্পগ্রাম।

আইল্যান্ড থেকে ফিরে ভিক্টোরিয়া জুবিলি মিউজিয়াম, গান্ধী মেমোরিয়াল, স্থানীয় মন্দির দেখা সাঙ্গ করে চললাম ১৬ কিমি দূরের কোন্ডাপল্লিতে। কোন্ডাপল্লি শিল্পগ্রাম। রাস্তার দু'ধারে দোকান তাতে শিল্পসামগ্রী তবে একদম ফাঁকা। একদিকে দর্শন অন্যদিকে স্মারক হিসেবে কাঠের পুতুল, চাবির রিং সংগ্রহ করলাম। অজস্র লোভনীয় কাঠের শিল্প নিদর্শন তবে দাম একটু বেশি।

শিল্প গ্রাম থেকে বেড়িয়ে কোন্ডাপল্লির পাহাড় শিরে দুর্গের পথে বের হলাম। বৃষ্টি, কৃষ্ণা নদী, পাহাড়ি পথ, পাহাড়ের ওপর সবুজ অরণ্যানী নির্জন আমরাই একমাত্র যাত্রী। টিকিট কেটে দুর্গে প্রবেশ। সময়ের ছাপ দুর্গে, অনেকখানি অংশ ভেঙে পড়েছে, তবে যেটুকু আছে তাও ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। রয়েছে মিউজিয়াম তৈলচিত্র, নানান সামগ্রী, যাঁরা ইতিহাস খোঁজেন, ভালবাসেন তাঁদের এই স্থান খুব ভাল লাগবে। দুর্গ রহস্য কাটিয়ে গাড়ি ছুটল মোঘল রাজপুরম গুহায়। এখানে রয়েছে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, শিব-গণেশ ও ব্রহ্মার মূর্তি। ধাপে-ধাপে ত্রিতল গুহামন্দির দর্শনীয়। উন্ডাভালী গুহায় অনন্তনাগের ওপর কালো পাথরের বিষ্ণু। এই স্থানগুলো পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। দেখতে-দেখতে ঘড়ির কাটা পাঁচটা পেরিয়ে গেছে। আরও একবার রওনা দিলাম কনকদুর্গা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এবার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সোজা পাহাড়ের ওপর পার্কিং লটে। ঘড়িতে ৫.৪৫ মিনিট। পনেরো মিনিটে পর মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ। আমরা পড়িমড়ি করে দৌঁড়ে টিকিট কেটে যাত্রার রেলিং ঘেরা পথে প্রবেশ করে জোড়সে হাঁটতে লাগলাম। সময়ের আগেই গর্ভগৃহের সামনে, গর্ভগৃহে দেবী দুর্গা বা পার্বতী সোনার মূর্তি, অষ্টভূজা, প্রবেশদ্বারে চুড়ি দিয়ে সাজানো এক বর্ণবাহার ব্যাপার। ভুলে গেলাম সারাদিনের ক্লান্তি, বৃষ্টিতে ভেজা। মন্দির চত্বর জুড়ে শিব, গণেশ, নানান দেবদেবীর অধিষ্ঠান।

সন্ধ্যা নামতেই আলো জ্বলে উঠল। আলোকিত মন্দির পাহাড় থেকে নিচের নদী শহর কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি। মন্দির থেকে বেড়িয়ে গাড়িতে বসলাম। এসি কার। এবার ফেরার পালা। বিজয়ওয়াড়া পিছনে ফেলে রেখে রাজামুন্দ্রির পথে। মাঝে চা, টিফিন । রাস্তার ধারে অজস্র ধাবা। রাতের অপরিচিত শহর দেখায় দারুণ। রাত দশটা নাগাদ বুঝতে পারলাম, রাজামুন্দ্রি ঢুকছি। আলোকিত গোদাবরীর ব্রিজ ঐ যে না, এখানেও ভাল বৃষ্টি হয়েছে। শহর যেন কাকভেজা হয়ে জেগে আছে।

চতুর্থ দিন আজ মন্দির দর্শনের দিন। দক্ষিণী স্থাপত্য, শিল্পরীতি প্রায় একরকম। সুবিশাল মন্দির, বিশাল গোপুরম, সুদ কার্যাবলী, মন্দিরের গায়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কথা, এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও ফুটে ওঠে। দর্শন পর্ব সুসংবদ্ধ, নিয়ম শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত, তবে যত পরিমাণ দর্শনী তত বেশি প্রতিমার কাছাকাছি যাওয়া যায়। জানি না, অর্থ সবচেয়ে বড় দেবতা কিনা?

২৪ কিমি দূরের দ্বারপুরীতে আয়াপ্পা মন্দির, দক্ষিণের কাশী হিসেবে স্বীকৃত দ্রক্ষারামে ভীমেশ্বর স্বামী মন্দির। কাকিনাড়া জেলাতে শ্রীসূর্যনারায়ণ স্বামী মন্দির, লদী গণপতি মন্দির, রাজমুন্দ্রি ২০ কিমি পাহাড়ের চূড়ায় নরসিমা স্বামী মন্দির।

বৃষ্টি মাথায় হাজির হলাম কাকিনাড়া জেলার সুপ্রাচীন মন্দির শ্রী কুক্কুটেশ্বর স্বামী মন্দির, পিঠাপুরমে এই মন্দির শক্তিপীঠ। শাক্ত-শৈব দুই সম্প্রদায়ের কাছে এর আকর্ষণ অনেকখানি। দেবী পুরদৃতিকা। মন্দিরের সামনে একশিলার নন্দী মূর্তি। গয়াসুরের উপাখ্যান এখানে জড়িয়ে আছে। কেউ বলেন এখানে দেবীর পিঠ, আবার কারুর মতে বাম হাত পড়েছিল। দেবীমূর্তি স্বর্ণ অলঙ্কারভূষিতা, রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত।

আন্নাভরণ মন্দিরও নাকি শক্তিপীঠ। সর্পভরণ মন্দির ভগবান বিষ্ণুর একটি প্রাচীনতম মন্দির। সারা দিন ভোর বৃষ্টি মাথায় মন্দির থেকে মন্দির ঘুরে ফিরলাম বেশ ক্লান্ত। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিতে হবে। আগামীকাল আমাদের ঘরে ফেরা।

রাজামুন্দ্রিতে আজ শেষ দিন। হোটেল থেকে বের হতে বেলা দশটা বেজে গেল। টিফিন করে গাড়ি ছেড়ে অটোতে স্থানীয় যেসব জায়গাগুলো বাকি আছে। প্রথমে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। একই গুরুগম্ভীর পরিবেশ। গোপুরমে দক্ষিণভারতী রামালু পাম্থালুর বাড়ি, বাকি ঘাট আর স্থানীয় মন্দির দেখে হোটেলে। দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম। রাতে ফলকনামা এক্সপ্রেসে চেপে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা। ফেরার সিট ভাল, তবে ফিরে যাওয়ার দুঃখ সঙ্গে। আবার একটা বছর অপেক্ষা। ■

নানা পাটেকর — সংগ্রাম থেকে কিংবদন্তি

অভিনয় যখন জীবনের ভাষা হয়ে উঠেছিল

উজ্জ্বল নন্দী

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু অভিনেতা আছেন, যাঁদের অভিনয় শুধু পর্দায় একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে না— দর্শকের মনে একটি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। নানা পাটেকর ছিলেন তেমনই একজন। তাঁর আসল নাম বিশ্বনাথ দীনকর পাটেকর। ১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুরুদ-জাঞ্জিরায় তাঁর জন্ম। প্রায় পাঁচ দশকের অভিনয় জীবনে হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্র, মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ— সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন।

শৈশব ঃ অভাবের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল এক অভিনেতা

নানা পাটেকরের জীবনের শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না। তাঁর বাবা দীনকর পাটেকর টেক্সটাইল পেইন্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং একটি ছোট ব্যবসা চালাতেন। কিন্তু বাবার ব্যবসায় বড় ধাক্কা আসার পর পরিবারের আর্থিক অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়ে যায়।

মাত্র তেরো বছর বয়সে, নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়, নানা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ শুরু করেন। তিনি সিনেমার পোস্টার আঁকতেন এবং সেই কাজ থেকে মাসে প্রায় ৩৫ টাকা পেতেন— সঙ্গে মিলত একবেলার খাবার। কাজের জায়গায় পৌঁছানোর জন্য তাঁকে বহুটা পথ হেঁটেও যেতে হতো। পরবর্তীকালে নানা নিজেই বলেছেন, সেই ক্ষুধা, অপমান এবং অভাবই তাঁকে জীবনকে অন্যভাবে দেখতে শিখিয়েছিল।

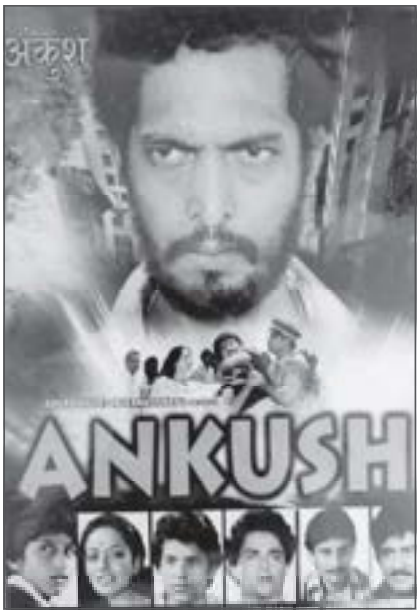
একসময় যে কিশোর সিনেমার পোস্টার আঁকতেন, কয়েক বছর পরে সেই পোস্টারেই নিজের মুখ দেখতে পাওয়া তাঁর জীবনের এক অসাধারণ পরিণতি। সেই ঘটনা যেন তাঁর জীবনকেই একটি পূর্ণ বৃত্তে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

বাবার নজর কাড়তে গিয়ে মঞ্চের প্রেমে

অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল খুব ছোটবেলাতেই। স্কুলজীবন থেকেই তিনি নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের স্মৃতিচারণে নানা বলেছেন, ছোটবেলায় তাঁর মনে হতো তাঁর বাবা হয়তো তাঁর বড় ভাইকে বেশি ভালোবাসেন। বাবার মনোযোগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি নাটকে আরও বেশি করে যুক্ত হতে থাকেন।

'ভাল্মীকি' নাটকে অভিনয় করার সময় তাঁর বাবা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা নানা পাটেকরের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ধীরে-ধীরে মঞ্চ তাঁর কাছে শুধু অভিনয়ের জায়গা নয়, নিজেকে প্রকাশ করার জায়গা হয়ে ওঠে।

পরে তিনি মুম্বাইয়ের স্যার জে জে ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড আর্টস-এ পড়াশোনা করেন এবং বাণিজ্যিক শিল্পী হিসেবেও কাজ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের টান তাঁকে অভিনয়ের পথেই নিয়ে যায়। মারাঠি মঞ্চ তাঁকে দিয়েছিল তাঁর অভিনয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র— কণ্ঠস্বর, শরীরী ভাষা, বিরতি, নীরবতা এবং সংলাপের ভিতরের আবেগ।



সিনেমায় প্রবেশ ঃ 'গমন' থেকে নতুন পথের শুরু

১৯৭৮ সালে 'গমন' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ। এরপর ক্রমশ তিনি হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্রে নিজের জায়গা তৈরি করতে থাকেন। তাঁর অভিনয়ের ধরন ছিল প্রচলিত নায়কোচিত অভিনয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

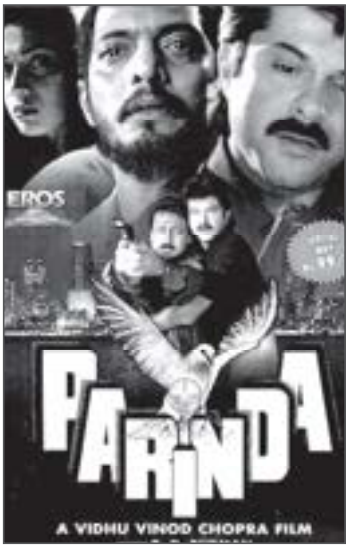
তিনি শুধু সংলাপ বলতেন না— সংলাপকে যেন চরিত্রের ভেতরের অনুভূতিতে পরিণত করতেন। কখনও গলা উঁচু না করেও তাঁর কণ্ঠ দর্শকের মনে ভয় তৈরি করতে পারত। আবার কখনও চোখের দৃষ্টি, মুখের সামান্য পরিবর্তন কিংবা দীর্ঘ নীরবতাই হয়ে উঠত গোটা দৃশ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী মুহূর্ত।

অভিনেত্রী স্মিতা পাটিলের উৎসাহও তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের শুরুর দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। নানা নিজেই এক সাক্ষাৎকারে স্মিতা পাটিলের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রবেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন।

'পরিন্দা' ঃ ভিলেনের সংজ্ঞাই বদলে দিলেন

১৯৮৯ সালের বিধু বিনোদ চোপড়া পরিচালিত 'পরিন্দা' নানা পাটেকরের ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় মোড়। ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন আন্না শেঠের চরিত্রে— একজন নির্মম অপরাধজগতের মানুষ, যার মধ্যে একইসঙ্গে ছিল নিষ্ঠুরতা, ক্ষমতা, ভয় এবং অতীতের ক্ষত।

আন্না চরিত্রটিকে নানা প্রচলিত ভিলেনের মতো করে অভিনয় করেননি। তিনি অতিরিক্ত চিৎকার বা নাটকীয় অঙ্গভঙ্গির বদলে ব্যবহার করেছিলেন ঠান্ডা স্বর, অস্বস্তিকর নীরবতা এবং চোখের দৃষ্টি। ফলে চরিত্রটি আরও বাস্তব এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।



'পরিন্দা'-র আন্না আজও ভারতীয় সিনেমার স্মরণীয় খলচরিত্রগুলোর অন্যতম। এই অভিনয়ের জন্য নানা পাটেকর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতার সম্মান লাভ করেন।

এই ছবির পর ভারতীয় সিনেমায় খলনায়ককে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসে। ভিলেন শুধু 'খারাপ মানুষ' নয়— তারও মনস্তত্ত্ব, অতীত এবং ভেতরের অন্ধকার থাকতে পারে— নানা সেই জটিলতাকে অভিনয়ের মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসেন।

'ক্রান্তিবীর' ঃ অভিনেতা থেকে এক জনতার কণ্ঠস্বর

১৯৯৪ সালের 'ক্রান্তিবীর' নানা পাটেকরের ক্যারিয়ারের আরেক ঐতিহাসিক অধ্যায়। প্রতাপ নারায়ণ তিলকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় শুধু পুরস্কার এনে দেয়নি, তাঁকে সাধারণ দর্শকের ঘরের মানুষ করে তুলেছিল।



এই ছবিতে তাঁর সংলাপ বলার ধরন, চোখের আগুন এবং চরিত্রের ক্ষোভ দর্শকদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।

তাঁর কণ্ঠে যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যেত, মনে হতো পর্দার চরিত্রটি শুধু কথা বলছে না— সমাজের জমে থাকা ক্ষোভই যেন ভাষা পাচ্ছে।

'অগ্নিসাক্ষী', 'খামোশি' এবং অভিনয়ের আরেক রূপ

নানা পাটেকরকে শুধু ভিলেন বা রাগী চরিত্রে আটকে রাখা যায়নি। 'অগ্নিসাক্ষী'-তে তাঁর অভিনয় তাঁকে আরও একটি জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়। তাঁর অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল— একটি চরিত্রকে কখনও একমাত্রিক করে না তোলা।

'খামোশি দ্য মিউজিক্যাল'-এ একজন বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী বাবার চরিত্রে তাঁর সংযত অভিনয় দেখিয়ে দিয়েছিল, তিনি চিৎকার না করেও দর্শকের চোখে জল আনতে পারেন।

এরপর 'আব তক ছাপ্পন', 'অপহরণ', 'রাজনীতি', 'ওয়েলকাম', 'দ্য অ্যাটাকস অব ২৬/১১', 'ড. প্রকাশ বাবা আমটে দ্য রিয়েল হিরো', 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'-সহ বিভিন্ন ছবিতে তিনি নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেন। বাস্তব চরিত্রের অনুপ্রেরণায় তৈরি ভূমিকাতেও তাঁর অভিনয়ের আলাদা পরিচয় ছিল।

'ওয়েলকাম' ঃ একই মানুষ, সম্পূর্ণ অন্য নানা

নানা পাটেকরের অভিনয়ের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম বড় প্রমাণ 'ওয়েলকাম'। এখানে 'উদয় ভাই' চরিত্রে তিনি যে হাস্যরস তৈরি করেছিলেন, তা তাঁর গম্ভীর অভিনয়-পরিচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত।

যে অভিনেতাকে 'ক্রান্তিবীর'-এ দেখে দর্শক উত্তেজিত হয়েছেন, 'পরিন্দা'-তে ভয় পেয়েছেন, 'খামোশি'-তে আবেগপ্রবণ হয়েছেন;সেই একই অভিনেতাকে 'উদয় ভাই'-এর হাস্যকর পরিস্থিতিতে দেখে দর্শক হেসেছেন। এখানেই নানা পাটেকরের বহুমুখিতা।

'নটসম্রাট' ঃ জীবনের শেষ প্রান্তে অভিনয়ের এক অনন্য শিখর

২০১৬ সালের মারাঠি ছবি 'নটসম্রাট' তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। গণপতরাও বেলওয়ালকর— একসময়ের বিখ্যাত মঞ্চ অভিনেতা, যিনি জীবনের শেষদিকে নিজের পরিবার, অতীত, অহংকার এবং একাকীত্বের সঙ্গে লড়াই করেন।

এই চরিত্রে নানা পাটেকর যেন নিজের দীর্ঘ মঞ্চজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ঢেলে দিয়েছিলেন। সংলাপের শক্তির পাশাপাশি তাঁর নীরবতা, অসহায়তা এবং ভেঙে পড়া মানুষের যন্ত্রণা ছবিটিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। 'নটসম্রাট'-এর গণপতরাও তাঁর অভিনয়জীবনের স্মরণীয় চরিত্রগুলোর একটি হয়ে থাকবে।

অভিনয়ের বাইরে ঃ মানুষের পাশে আরেক নানা

নানা পাটেকরের জীবনকে শুধু সিনেমা দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তাঁর গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

২০১৫ সালে অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরে-র সঙ্গে তিনি এনএএএম ফাউন্ডেশন গড়ে তোলেন। মহারাষ্ট্রের খরা, কৃষকদের দুর্দশা এবং কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাগুলো তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। প্রথমদিকে নানা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে সাহায্য করেন। পরে সেই উদ্যোগই একটি সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পায়।

এনএএএম ফাউন্ডেশন-এর কাজ শুধু অর্থসাহায্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষকদের জীবিকা এবং খরাপ্রবণ অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ওপরও তারা কাজ করেছে।

নানা পাটেকরের এই পরিচয়টি তাঁর চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ— পর্দায় তিনি মানুষের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা অভিনয় করেছেন, আর বাস্তব জীবনে সেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় নানা পাটেকর ভারতীয় সেনার সঙ্গে থাকার এবং তাঁদের পাশে থেকে সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রির সঙ্গে তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগের সূত্রে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি গিয়ে সেনাদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন। তাঁর এই অধ্যায় তাঁর দেশপ্রেম ও সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধার আরেকটি দিক তুলে ধরে।

তবে তাঁকে 'কার্গিল যুদ্ধে মেজর হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন'— এমন দাবি না করাই সঠিক— তাঁর সামরিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত অনেক লেখায় বিষয়টি অতিরঞ্জিত হয়েছে।

পুরস্কার ঃ সংখ্যার চেয়ে বড় ছিল তাঁর অভিনয়ের ছাপ

নানা পাটেকর তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলেন— 'পরিন্দা'-র জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা, 'অগ্নিসাক্ষী'-র জন্য আবার শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা এবং 'ক্রান্তিবীর'-এর জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে। এছাড়াও তিনি একাধিক ফিল্মফেয়ার ও অন্যান্য সম্মান পেয়েছেন। ২০১৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। সরকারি পদ্ম পুরস্কারের তালিকাতেও তাঁর নাম 'বিশ্বনাথ দীনকর পাটেকর ওরফে নানা পাটেকর' হিসেবে রয়েছে।

কিন্তু নানা পাটেকরের প্রকৃত পুরস্কার ছিল দর্শকের স্মৃতিতে বেঁচে থাকা তাঁর চরিত্রগুলো— আন্না, প্রতাপ, উদয় ভাই, সাধু আগাশে, গণপতরাও— প্রতিটি চরিত্র যেন আলাদা এক জীবন।



শেষ অধ্যায়

২০২৬ সালের ৮ অক্টোবর গোয়ায় নিজের বাড়িতে নানা পাটেকরের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। হাসপাতাল সূত্রে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কথা জানানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে গভীর শোক নেমে আসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ চলচ্চিত্র ও সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

তাঁর চলে যাওয়া শুধু একজন অভিনেতার মৃত্যু নয় — একটি স্বতন্ত্র অভিনয় ভাষার অবসান।

আজ নানা পাটেকর নেই। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর চোখের দৃষ্টি, তাঁর সংলাপের আগুন এবং তাঁর অভিনয়ের সত্যতা ভারতীয় সিনেমার স্মৃতিতে বহুদিন বেঁচে থাকবে।

কিংবদন্তিরা চলে যান, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি থেকে যায়। নানা পাটেকরের ক্ষেত্রেও তাই— মানুষটি চলে গেলেন, অভিনেতাটি রয়ে গেলেন।

নানা পাটেকর - সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র তালিকা (১৯৭৮ - ২০২৬)

পর্ব ১ শুরুর দিক (১৯৭৮-১৯৮৮)

১. ১৯৭৮ - গমন - বাসু (হিন্দি)
২. ১৯৭৯ - সিংহাসন - স্মাগলার (মারাঠি)
৩. ১৯৮০ - ভালু - রাঙ্গারাও (মারাঠি)
৪. ১৯৮২ - রঘু ময়না - রঘু
৫. ১৯৮৩ - সাবিত্রী - বাবন
৬. ১৯৮৪ - আজ কি আওয়াজ - জগমোহনদাস (হিন্দি)
৭. ১৯৮৪ - গিধ - বীরাপ্পন

৮. ১৯৮৫ - গাদ জেজুরি জেজুরি - খাণ্ডু (মারাঠি)
৯. ১৯৮৬ - অঙ্কুশ - রবীন্দ্র কেলকার 'রবি' (হিন্দি)
১০. ১৯৮৬ - মাফিচা সাক্ষীদার - রাঘবেন্দ্র (মারাঠি)
১১. ১৯৮৬ - ফাঁসি কা ফান্দা - রাঘবেন্দ্র (হিন্দি)
১২. ১৯৮৭ - শীলা
১৩. ১৯৮৭ - সূত্রধর - কুমার
১৪. ১৯৮৭ - মোহরে - আব্দুল
১৫. ১৯৮৭ - অন্ধ যুদ্ধ - এস.পি. সুহাস দাণ্ডেকর
১৬. ১৯৮৭ - প্রতিঘাত - এক্স-কনস্টেবল কর্মবীর
১৭. ১৯৮৭ - আওয়াম - কর্নেল মোস্তাফা আলি জাহিদি
১৮. ১৯৮৮ - ত্রিশাগ্নি - উচন্দা
১৯. ১৯৮৮ - সাগর সঙ্গম - রামনাথ শাস্ত্রী / রামু উস্তাদ
২০. ১৯৮৮ - সালাম বম্বে - বাবা

পর্ব ২ জাতীয় পুরস্কার ও তারকা খ্যাতি (১৯৯০-২০০৫)

২১. ১৯৯০ - পরিন্দা - আন্না শেঠ
২২. ১৯৯০ - থোড়া সা রুমানি হো যায়ে - নটবরলাল
২৩. ১৯৯০ - দিশা - বসন্ত ডি. মান্ড্রে
২৪. ১৯৯১ - প্রহার দ্য ফাইনাল অ্যাটাক - মেজর চৌহান (পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার)
২৫. ১৯৯১ - দীক্ষা - কোজা পণ্ডিত
২৬. ১৯৯২ - রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান - জয়
২৭. ১৯৯২ - অঙ্গার - মাজিদ খান
২৮. ১৯৯৩ - তিরাঙ্গা - শিবাজীরাও ওয়াগলে
২৯. ১৯৯৪ - ক্রান্তিবীর - প্রতাপ নারায়ণ তিলক
৩০. ১৯৯৪ - অভয় - ভূত
৩১. ১৯৯৫ - হাম দোনো - বিশাল সাইগল
৩২. ১৯৯৬ - অগ্নি সাক্ষী - বিশ্বনাথ
৩৩. ১৯৯৬ - খামোশি দ্য মিউজিক্যাল - জোসেফ ব্রাগাঞ্জা
৩৪. ১৯৯৭ - গোলাম-এ-মোস্তফা - গোলাম-এ-মোস্তফা
৩৫. ১৯৯৭ - যশবন্ত - যশবন্ত লোহার
৩৬. ১৯৯৮ - যুগপুরুষ - অনিরুদ্ধ
৩৭. ১৯৯৮ - ওয়াজুদ - মলহর গোপালদাস অগ্নিহোত্রী / কর্নেল লাট্টি
৩৮. ১৯৯৯ - হু তু তু - ভাউ
৩৯. ১৯৯৯ - কোহরাম - মেজর অজিত আর্য
৪০. ২০০০ - গ্যাং - আব্দুল
৪১. ২০০০ - তারকিব - সিবিআই ইন্সপেক্টর জসরাজ প্যাটেল
৪২. ২০০২ - বধ - ডা. অর্জুন সিং
৪৩. ২০০২ - শক্তি দ্য পাওয়ার - নরসিংহ
৪৪. ২০০৩ - ভূত - ইন্সপেক্টর লিয়াকত কুরেশি
৪৫. ২০০৩ - ডরনা মানা হ্যায় - জন রড্রিগেজ
৪৬. ২০০৩ - আঁচ - মহাদেব
৪৭. ২০০৪ - আব তক ছাপ্পান - ইন্সপেক্টর সাধু আগাসে
৪৮. ২০০৫ - অপহরণ - তাবরেজ আলম
৪৯. ২০০৫ - পাক পাক পাকাক - ভুত্যা (মারাঠি)
৫০. ২০০৫ - ব্লাফমাস্টার! - চান্দু পারেখ

পর্ব ৩ শেষ অধ্যায় (২০০৬-২০২৬)

৫১. ২০০৬ - ফির হেরা ফেরি - কথক
৫২. ২০০৬ - ট্যাক্সি নং ৯২১১ - রাঘব শাস্ত্রী
৫৩. ২০০৭ - হ্যাটট্রিক - ডাক্তার
৫৪. ২০০৭ - দশ কাহানিয়া - বেলুনওয়ালা
৫৫. ২০০৭ - ওয়েলকাম - ডন উদয় শেট্টি
৫৬. ২০০৭ - যাত্রা - দশরথ জোগলেকর
৫৭. ২০০৭ - দ্য পুল - বাংলো মালিক
৫৮. ২০০৮ - এক দ্য পাওয়ার অফ ওয়ান - সিবিআই অফিসার রানে
৫৯. ২০০৮ - বোম্মালাট্টম - রানা (তামিল)
৬০. ২০১০ - পাঠশালা - প্রিন্সিপাল আদিত্য সহায়
৬১. ২০১০ - রাজনীতি - ব্রিজ গোপাল
৬২. ২০১০ - তুম মিলো তো সহি - সুব্রামানিয়াম
৬৩. ২০১০ - যক্ষ - পুলিশ অফিসার (কন্নড়)
৬৪. ২০১১ - শাগির্দ - হনুমন্ত সিং
৬৫. ২০১১ - দেউল - ভাউ গালান্ডে (মারাঠি)
৬৬. ২০১২ - কামাল ধামাল মালামাল - কাল্লু
৬৭. ২০১৩ - দ্য অ্যাটাকস অফ ২৬/১১ - রাকেশ মারিয়া
৬৮. ২০১৪ - ড. প্রকাশ বাবা আমটে দ্য রিয়েল হিরো - ড. প্রকাশ আমটে (মারাঠি)
৬৯. ২০১৪ - যশবন্তরাও চৌহান - বখর একা ওয়াদালাচি - প্রতাপ দেশমুখ
৭০. ২০১৫ - আব তক ছাপ্পান ২ - ইন্সপেক্টর সাধু আগাসে
৭১. ২০১৫ - ওয়েলকাম ব্যাক - উদয় শেট্টি
৭২. ২০১৬ - দ্য জাঙ্গল বুক - শের খান (হিন্দি ডাবিং)
৭৩. ২০১৬ - নটসম্রাট - গণপতরাও রামচন্দ্র বেলওয়ালকর (মারাঠি) - প্রযোজকও



৭৪. ২০১৬ - ফাইনাল কাট অফ ডিরেক্টর - রানা
৭৫. ২০১৭ - ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি - নাগার্জুন
৭৬. ২০১৭ - গোলমাল এগেইন - নিজে (ক্যামিও)
৭৭. ২০১৮ - আপলা মানুষ - মারুতি নাগারগোজে / আব্বা গোখলে (মারাঠি)
৭৮. ২০১৮ - কালা - হরিদেব অভয়ঙ্কর (তামিল)
৭৯. ২০২০ - ইটস মাই লাইফ - ব্যবসায়ী
৮০. ২০২২ - তড়কা - তুকারাম দলভি
৮১. ২০২৩ - গদর ২ - কথক
৮২. ২০২৩ - দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার - ড. বলরাম ভার্গব
৮৩. ২০২৪ - ওলে আলে - ওমকার লেলে (মারাঠি)
৮৪. ২০২৪ - বনবাস - প্রতাপ সিংহানিয়া
৮৫. ২০২৫ - হাউসফুল ৫ - ধগড়ু হুলগুন্ড
৮৬. ২০২৬ - ও' রোমিও - ইসমাইল খান
৮৭. ২০২৬ - সুবেদার - নানা ওয়াঘমারে

মোট ৮৭টি ছবি - একটাই তালিকায়।

৩টে জাতীয় পুরস্কার, ৪টে ফিল্মফেয়ার, পদ্মশ্রী (২০১৩)।

কেন মানুষ তাঁকে এত ভালোবাসে জানেন?

- ডায়লগ ডেলিভারি 'এক মচ্ছর আদমি কো হিজড়া বানা দেতা হ্যায়' — ক্রান্তিবীর
- রাগ আর ভালোবাসা একসাথে — পরিন্দা, প্রহার, অগ্নিসাক্ষী, নটসম্রাট
- কমেডি — ওয়েলকাম এর উদয় শেট্টি

বাস্তব জীবনে বিবিধ গুণের অধিকারী (ভাল তবলা বাজাতেন) নানা পাটেকর রাইফেল শুটিং-এর প্রতি শুধু বিশেষ আগ্রহীই ছিলেন না, দেশের অন্যতম সেরা মহিলা শুটার অঞ্জলি ভাগবতকে স্পনসরও করেছেন। কৃষকদের জন্য 'নাম ফাউন্ডেশন' তৈরি করেছিলেন। তিনি জীবনে যা আয় করতেন তার ৯০ শতাংশ এইভাবে সমাজসেবার কাজে ব্যয় করতেন। তাঁর সাহায্যের তালিকায় ছিলেন দুঃস্থ মঞ্চ শিল্পীরা। ■



বাংলার রেখা

উজ্জ্বল নন্দী

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু অভিনেত্রী আছেন, যাঁদের অভিনয়জীবন হয়তো খুব দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা দর্শকের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন। মিঠু মুখার্জি তাঁদেরই একজন।

যে সময় মিঠু মুখার্জি বাংলা ছবিতে আসেন, তখন টালিগঞ্জে দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, অপর্ণা সেনের মতো অভিনেত্রীরা। তাঁর অভিনয় জীবনের সময়কালেই নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী হিসেবে দেবশ্রী রায়, মুনমুন সেন, আলপনা গোস্বামীরাও উঠে আসেন। এত প্রতিযোগিতার মধ্যেও মিঠু নিজের জন্য আলাদা একটি জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।



তাঁর অভিনয়জীবনের কথা উঠলেই প্রথমেই মনে পড়ে 'মৌচাক' এবং 'স্বয়ংসিদ্ধা'-র কথা। দুটি ছবিতেই তাঁর নায়ক ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক। বিশেষ করে 'স্বয়ংসিদ্ধা' ১৯৭৫ সালে মুক্তির পর যথেষ্ট সাফল্য পায় এবং মিঠু-রঞ্জিত জুটির জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে। দর্শকের কাছে তাঁদের পর্দার রসায়নও প্রশংসিত হয়।

শুধু এই দুটি ছবিই নয়, 'মর্জিনা আবদল্লা'-তেও মিঠুর অভিনয় নজর কেড়েছিল। তাঁর অভিনয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল — চরিত্রকে নিজের উপস্থিতি দিয়ে আলাদা করে তুলে ধরা। তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, তাঁর অভিনয়ের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র আত্মবিশ্বাস এবং পর্দা দখল করার ক্ষমতা ছিল। সেই কারণেই কেউ-কেউ বাংলা চলচ্চিত্রের মিঠুকে হিন্দি ছবির রেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মিঠুর অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর ছবির গানগুলিও তাঁর জনপ্রিয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। 'বেশ করেছি প্রেম করেছি', 'প্রেম কিসে হয় কেউ কি জানে', 'আলো আর আলো দিয়ে', 'পাগলা গারদ কোথায় আছে' — এই ধরনের গানের দৃশ্যে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মনে আলাদা ছাপ ফেলেছিল। তাঁর পর্দার ব্যক্তিত্বে ছিল এক ধরনের আধুনিকতা ও আত্মবিশ্বাস, যা সেই সময়ের বাংলা ছবিতে তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল।

মিঠু মুখার্জির অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে রঞ্জিত মল্লিকের প্রশংসার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মিঠু ছিলেন একজন অসাধারণ অভিনেত্রী। কোনও দৃশ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে বারবার বলতে হতো না। চরিত্রটি নিজের মতো করে গ্রহণ করে পর্দায় তা ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তিনি।

রঞ্জিত মল্লিকের স্মৃতিচারণে আরও উঠে এসেছে একটি আক্ষেপ — যে সময় বাংলা ছবিতে মিঠুর আরও বেশি প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময় তিনি হিন্দি ছবিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে বম্বে চলে যান।

বাংলা ছবিতে সাফল্যের পর মিঠু মুখার্জির সামনে হিন্দি ছবিতে কাজ করার সুযোগ আসে। 'খানদোস্ত' ছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ছবিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ কাপুর, শত্রুঘ্ন সিনহা, জগদীপ, যোগিতা বালি, অসিত সেন, সুভাষ ঘাই, সত্যেন কাপুর প্রমুখ। রাজ কাপুর ছিলেন মিঠুর প্রিয় অভিনেতা। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তাই মিঠুর কাছে বিশেষ আকর্ষণের ছিল।

'খানদোস্ত'-এ মিঠুর অভিনয় প্রশংসিত হলেও হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি যে ধরনের প্রতিষ্ঠা আশা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা ঘটেনি।

১৯৭৬ সালে তাঁর দুটি বাংলা ছবি মুক্তি পায় — 'হোটেল স্নো ফক্স' এবং 'চাঁদের কাছাকাছি'। দুটিতেই উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তিনি। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতির ধারাটি ততদিনে বদলে যেতে শুরু করেছে।



পরবর্তী কয়েক বছরে মিঠু 'সফেদ ঝুট', 'দিল্লাগী' এবং 'দো লড়কে দোনো কড়কে'-র মতো হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর চরিত্রগুলি ক্রমশ পার্শ্বচরিত্র বা অতিথি শিল্পীর পর্যায়ে চলে যায়। ফলে হিন্দি ছবিতে নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি মুম্বাই গিয়েছিলেন, তা পূরণ হয়নি।

শত্রুঘ্ন সিনহাও মিঠুর স্মার্টনেস ও আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মতে, কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ে এসে মিঠু সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবং হিন্দি চলচ্চিত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যও তাঁর ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য সফল হয়নি।

মুম্বাই পর্বের পর মিঠু মুখার্জি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৭৭ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিমা' গল্প অবলম্বনে নির্মিত ছবিতেও তাঁকে দেখা যায়। এরপর তিনি 'সন্ধি', 'ভাগ্যচক্র', 'বন্ধন', 'ফাদার' এবং 'দুজনে'-র মতো কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন।

এই পর্যায়ে তাঁর ছবির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্যনির্ভর গল্পের প্রতি আগ্রহ। বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি সাহিত্যভিত্তিক চরিত্রে কাজ করার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল।

নিজে ছবি প্রযোজনা করার সিদ্ধান্ত নিলে মিঠু মুখার্জি বেছে নেন প্রতিভা বসুর গল্প 'রাঙা ভাঙা চাঁদ'। সেই গল্প অবলম্বনেই তৈরি হয় 'আশ্রিতা'।

ছবিটির চিত্রনাট্য যৌথভাবে লেখেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও মিঠু মুখার্জি। পরিচালনার দায়িত্ব পান চন্দ্র বারোট — যিনি 'ডন'-এর পরিচালক হিসেবে পরিচিত। ছবিটির কাজ প্রথমে দীনেন গুপ্ত শুরু করেছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর চন্দ্র বারোট দায়িত্ব নেন।

'আশ্রিতা' শুধু মিঠুর অভিনয় জীবনের শেষ ছবি নয়, তাঁর প্রযোজক হিসেবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ছবিটি সাফল্য পায় এবং 'আশ্রিতা'-র নায়িকা হিসেবে মিঠুর অভিনয় দর্শকের মনে থেকে যায়।

ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। কিশোর কুমারের কণ্ঠে 'নীল নীল আকাশে চাঁদ ওই যখন হাসে' গানটিও ছবিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পুরনো শ্রোতাদের অনেকের স্মৃতিতে গানটি আজও আলাদা জায়গা করে আছে।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 'আশ্রিতা'-র পর মিঠু মুখার্জি আর কোনও ছবি প্রযোজনা করেননি এবং অভিনয়ও আর করেননি। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি চলচ্চিত্রজগৎ থেকে সরে দাঁড়ান।

মিঠু মুখার্জির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য তুলনামূলকভাবে অল্প। অভিনেত্রী রত্না ঘোষালের স্মৃতিচারণ থেকে কলকাতায় মিঠুর বিভিন্ন বাসস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তিনি মুম্বাইয়ে থাকতেন এবং মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসতেন বলেও ওই লেখায় দাবি করা হয়েছে।

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় সম্পর্কেও বিভিন্ন লেখা ও স্মৃতিচারণে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন এবং মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মিঠু মুখার্জির চলচ্চিত্রজীবন দীর্ঘ নয় — বরং তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হয়তো তার সংক্ষিপ্ততা। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন।

তাঁর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আফসোসের জায়গাটিও এখানেই। বাংলা ছবিতে যখন তিনি ক্রমশ নিজের অবস্থান শক্ত করছিলেন, তখনই মুম্বাইয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর কর্মজীবনের গতিপথ বদলে দেয়। পরে কলকাতায় ফিরে এলেও আগের জায়গায় ফেরার সুযোগ আর তৈরি হয়নি।

তবু মিঠু মুখার্জিকে শুধু 'অসমাপ্ত সম্ভাবনা' হিসেবে দেখলে তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করা হবে। বাংলা চলচ্চিত্রের যে সময়ে একাধিক শক্তিশালী অভিনেত্রী দর্শকের মন জয় করছিলেন, সেই সময়ে নিজের অভিনয়শৈলী, ব্যক্তিত্ব এবং পর্দার উপস্থিতি দিয়ে মিঠু মুখার্জি যে আলাদা পরিচয় তৈরি করেছিলেন, সেটিই তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে।

সময়ের হিসেবে তাঁর চলচ্চিত্রজীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্মৃতিতে তাঁর উপস্থিতি তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ।

মিঠু মুখার্জির সিনেমার তালিকা ঃ

১. শেষ পর্ব (১৯৭২)
২. মর্জিনা আবদুল্লা (১৯৭৩)
৩. নিশি কন্যা (১৯৭৩)
৪. কবি (১৯৭৪)
৫. মৌচাক (১৯৭৪)
৬. স্বয়ংসিদ্ধা (১৯৭৫)
৭. চাঁদের কাছাকাছি (১৯৭৬)
৮. হোটেল স্নো ফক্স (১৯৭৬)
৯. খানদোস্ত (১৯৭৬)
১০. প্রতিমা (১৯৭৭)
১১. সফেদ ঝুট (১৯৭৭)
১২. দিল্লাগি (১৯৭৮)
১৩. দো লড়কে দোনো করকে (১৯৭৮)
১৪. ভাগ্যচক্র (১৯৮০)
১৫. সন্ধি (১৯৮০)
১৬. বন্ধন (১৯৮০)



১৭. ফাদার (১৯৮১)
১৮. জৈন পুয়া (১৯৮২)
১৯. দুজনে (১৯৮৪)
২০. প্রার্থনা (১৯৮৪)
২১. আশ্রিতা (১৯৯০)

মৌচাক সিনেমাটির প্রথমে নাম ছিল 'সেই ফুল ফোটে'। পরে নাম পরিবর্তিত হয়। আশ্রিতা ছবিটি ১৯.১০.১৯৯০-এ মুক্তি পায়। তবে এর রেকর্ড অনেক আগেই ১৯৮৪ সালে 'রাঙা ভাঙা চাঁদ' নামে প্রকাশিত হয়।

পুরো ফিল্মি কেরিয়ারে মিঠু মুখার্জি ২১টি সিনেমা করেছেন। এর মধ্যে হিট/সুপারহিট/ব্লকব্লাস্টার ৮টি। হিট ৩৮ শতাংশ। তবে হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া ছবিতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আজও দর্শকমনে জায়গা করে আছে। ৭১ বছর বয়সে ওনার চলে যাওয়ার সংবাদে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা মর্মাহত। ■

নক্ষত্র পতন

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত চিত্রকর যোগেন চৌধুরী ২০২৬ সালের ২৫ অক্টোবর ৮৭ বছর বয়সে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন। তিনি রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি গত ১৬ অক্টোবর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সংক্রমণ-সহ একাধিক শারীরিক জটিলতার জন্য তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তিনি একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সমাজ ও রাজনীতির কদর্য বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এঁকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। রাজনীতিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন; তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

তাঁর পিতা প্রমথনাথ চৌধুরী ফরিদপুরের জমিদার ছিলেন। তাঁর আড়াই হাজার বিঘা জমি ছিল। যোগেন চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়। গ্রামের নাম ডহরপাড়া। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ বিভাজনের পর ১৯৫০ সালে তাঁর পরিবার বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। তিনি অবশ্য ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আসেন। ১৯৫১ থেকে ঢাকুরিয়ার শহিদনগর কলোনিতে বসবাস করেন। তিনি সরকারি আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন। সরকারি আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট কলেজে পড়ার সময় যাঁদের তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন ব্রহ্ম, দেবকুমার রায়চৌধুরী, অপর্ণা রায়, বরেন নিয়োগী, রথীন মৈত্র, সত্যেন ঘোষাল, হরেন দাস, গোপাল ঘোষ ও কিশোরী রায়কে। তিনি প্রথমে হাওড়া স্কুলে ও পরে হ্যান্ডলুম বোর্ডে কিছু দিন চাকরি করেন।



তিনি ফরাসি সরকারের বৃত্তিতে ১৯৬৫ সালে প্যারিসে গিয়েছিলেন এবং চিত্রকলা বিষয়ে গবেষণা করেন। প্যারিসের উইলিয়াম হ্যাটারের আতেলিয়ের ১৭ ও একোল নাসিওনাল সুপেরিয়র দে বোজ আর কাজ করেন। অতঃপর তিন বছর ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, মিশর সহ বিভিন্ন জাদুঘর ও গ্যালারি পরিদর্শন করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে দেশে ফিরে চেন্নাইয়ে কিছুদিন টেক্সটাইল ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২ সালে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে কিউরেটর হিসাবে কাজ শুরু করেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেছেন।

তাঁর বড় ভাই কলকাতার বামপন্থী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। সেই সূত্রে বিভিন্ন বামপন্থী শিল্প কর্ম ও দর্শন এবং সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে যোগেন চৌধুরীর পরিচয় ঘটে। তিনি মানব মুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। জীবনের অন্ধকার ও যন্ত্রণার দিক তাঁর ছবিতে স্থান লাভ করেছে।

যোগেন চৌধুরীর পিতা জমিদার হলেও ছবি আঁকতে ও মূর্তি গড়তে ভালবাসতেন। মা-ও আঁকতেন। পিতার জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্রের পিছনে আঁকিবুকির মধ্য দিয়ে শৈশবেই যোগেন চৌধুরীর চিত্রাঙ্কণে হাতেখড়ি। তাঁর মা-ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। কলকাতার বাড়িতে দেওয়ালে একটি ময়ূরের ছবি এঁকেছিলেন। এটিই তাঁর জীবনের প্রথম চিত্রকর্ম। কুমোর যখন দুর্গা প্রতিমা বানাতে আসত, তখন তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। খড়, তুষ ইত্যাদি কীভাবে কুমোরের দক্ষ হাতে মুখ, হাত, আঙুল হয়ে যেত সেগুলো তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। মাটিতে গড়া মূর্তি রঙীন করার বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করতেন মনোযোগ দিয়ে। এভাবেই শৈশবে তাঁর মধ্যে শিল্পবোধ জাগ্রত হয়। শৈশবের স্মৃতি তাঁর চিত্রকর্মে প্রতিফলিত। প্যারিসের অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্রে আধুনিকতা নিয়ে আসে। জলরং, প্যাস্টেল, তেল রং বা শুধু কালি — এসব বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রথম দিককার চিত্রকর্মে পিকাসোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সার্বিকভাবে ভারতীয় শিল্প আন্দোলন ও ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর চিত্রাঙ্কণ রীতিতে। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের পর কলকাতার শরণার্থী শিবিরে দেখা উদ্বাস্তু নারী-পুরুষের বহু প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন করেন। এই সব ছবিতে বলিরেখা বোঝাতে যে হ্যাচিং ও ক্রস-হ্যাচিং-এর ব্যবহার আরম্ভ করেন, সেইগুলি পরবর্তীকালে তাঁর রচনাশৈলীর অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়।

৬০-এর দশক থেকে শুরু করে কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহর এবং বিদেশে তাঁর বহু একক ও গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। লেখালিখিতেও যোগেন চৌধুরী বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি লিখেছেন শিল্পীদের নিয়েও। রবীন্দ্রনাথ থেকে চিত্তপ্রসাদ, কমলকুমার মজুমদার, সোমনাথ হোড়, গণেশ হালুই, গণেশ পাইন — বাদ যাননি মকবুল ফিদা হুসেন। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ধারাবাহিক লেখাটিতে যোগেন চৌধুরীর দীর্ঘ চিত্রশিল্পী জীবনের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা জানা যায়। তিনি কবিতাও লিখেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা বইয়ের প্রকাশক ছিলেন আর এক প্রখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীতে অন্য প্রকাশকরাও তাঁর কবিতার বই প্রকাশ করেছেন।

অসংখ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত যোগেন চৌধুরী শেষ জীবনে তৈরি করেছিলেন 'চারুবাসনা', 'যোগেন চৌধুরী সেন্টার ফর আর্টস'। তৃণমূলে যোগদানের পর যোগেন চৌধুরীকে সম্পাদক করে একটি চিত্রকলা ও সেই সম্পর্কীয় একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী ওই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কসবায় প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রীর বাড়িতে ওই পত্রিকার একটি সভাতে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সূত্রে 'সময় পরিবর্তন'-এর পুজো সংখ্যাতে একবার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যোগেন চৌধুরী। স্বল্প পরিচয়ে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি মানুষ হিসেবেও তিনি অমূল্য হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে জানাই আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। ■

তৃণমূল ছাড়ায় দেবের জনপ্রিয়তা কমেছে

রিমা গঙ্গোপাধ্যায়

চলতি বছরে বাংলা সিনেমার ব্যবসায়িক হালচাল নিয়ে গত আগস্ট সংখ্যায় আমার শেষ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বলেছিলাম, ১৪ আগস্ট মুক্তিপ্রাপ্ত দেবের 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' এবং জিতের 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' হিট হলে এ বছর বাংলা ছবির যে ব্যবসায়িক খরা চলছে তা কাটবে। কিন্তু দেবের ছবি মুক্তি পায়নি। কারণ জিতের ছবির প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী — দেবকে তাঁর ছবির রিলিজ পিছিয়ে দিতে অনুরোধ করায় তিনি রাজি হয়ে যান। তবু 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' হিট করেছে বলে মনে হয়নি, যদিও ছবিটির সাকসেস পার্টি উদ্‌যাপন হয়। এর ফলে তৃণমূল ছাড়ার পর দেবের জনপ্রিয়তার পরীক্ষার জন্য পুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কৌতুহলের আরও কারণ, এটি তাঁর প্রথম পরিচালনা।



দুর্গাপুজোয় দেবের 'দেশু ৭', নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'বহুরূপী — দ্য গোল্ডেন ডাকু', সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'এম্পারার ভার্সাস শরৎচন্দ্র' এবং 'দ্য একেন — কেরালায় কুরুক্ষেত্র' মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট হয়। ছবির প্রচারে দেখা যায় দেব-শুভশ্রী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ফটোশুট, যা আগে দেখা যায়নি। দেব সাম্প্রতিক তাঁর ছবির সাফল্যের জন্য নৈহাটীর বড় মা'র মন্দিরে পুজো দিলেও 'দেশু ৭'-এর জন্য বেছে নেন ত্রিপুরার এক মন্দির। জনপ্রিয় বাংলা বিনোদনমূলক পাক্ষিকে রাজ



চক্রবর্তী-শুভশ্রীর ঘর ভাঙছে বলে চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন তোলা হলেও বাস্তবে কিছু হয়নি।



ছবিগুলি রিলিজের দিনে একমাত্র দেবের 'দেশু ৭' ঘিরে তাঁর ফ্যানক্লাবের উন্মাদনা এবং উত্তর কলকাতার 'বিনোদিনী থিয়েটার'-এ উৎসাহী দর্শকদের বিনামূল্যে ছবির নাম লেখা গেঞ্জি উপহার দেওয়া হয়, তবে আগের সেই জৌলুস ছিল না।

আমার হিসেবে চারটি ছবির রিপোর্ট কার্ড বলছে, সবথেকে হিট 'বহুরূপী' ছবিটির দ্বিতীয় ভাগ 'বহুরূপী — দ্য গোল্ডেন ডাকু'। দ্বিতীয় স্থানে 'ধুরন্ধর'-এর অনুকরণে তৈরি 'দেশু ৭'। তারপর 'দ্য একেন — কেরালায় কুরুক্ষেত্র'। শেষে সৃজিতের ছবি। কিন্তু সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক বলেছে একনম্বর 'দ্য একেন — কেরালায় কুরুক্ষেত্র'। আমি 'বিনোদিনী থিয়েটার'-এ 'বহুরূপী — দ্য গোল্ডেন ডাকু' নিয়মিত হাউসফুল হতে দেখেছি। 'দেশু ৭'-ও হাউসফুল হয়েছে। কিন্তু 'দ্য একেন — কেরালায় কুরুক্ষেত্র'-কে কখনওই দেখিনি। এটি এসভিএফ-এর ছবি বলেই কি এমন বলা হয়? যাতে দর্শক বাড়তি আগ্রহ দেখায়? এটা ঠিক দেবের ছবি নিয়ে গত বছরও যে হাইপ দেখা গিয়েছিল তা 'দেশু ৭' ঘিরে হয়নি।



তিনটি ছবি ব্যবসায়িকভাবে সফল। পিছিয়ে যায় সৃজিতের ছবি। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে ভাল ছিল। এ বছর শরৎচন্দ্রের ১৫০ বছর। 'পথের দাবী'র ১০০। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটের সিনেমা দেখার দর্শক এখন কোথায়? সব দেখে বলতে হচ্ছে, তৃণমূল ছাড়ায় দেবের জনপ্রিয়তা কমেছে। ■

বিজেপির সিদ্ধান্তে সমস্যায় সঙ্গীতশিল্পী ও কলাকুশলীরা

দেবশ্রী মিত্র

রাজ্যে প্রথম ক্ষমতায় আসা বিজেপির নিত্য-নতুন ফরমানে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের সমস্যা এখন সর্বজনবিদিত। মন্ত্রী-বিধায়কদের বক্তব্য, গত ৪৯ বছরে (বামফ্রন্ট ৩৪ ও তৃণমূল ১৫ বছর) পশ্চিমবঙ্গে যা হয়নি বা যা হয়েছে তা ঠিক ছিল না। বিজেপি সরকার সবার থেকে আলাদা। আমরা নতুনভাবে গড়ে তুলব রাজ্যকে। তার জন্যই বহু ক্ষেত্রে নতুন বিধান। তাতে সেই জগতের মানুষজনের এত দিনকার রোজগার বন্ধ হলেও বিজেপি নির্বিকার। তারা তাদের মতো বঙ্গকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। তারই জেরে এবার বিজেপি সরকারের কোপে সঙ্গীত শিল্পী ও তার সঙ্গে জড়িত কলাকুশলীরা।

পশ্চিমবঙ্গে গণেশ পুজো থেকে সাম্প্রতিক সময়ের পুজো মরশুম শুরু হচ্ছে। গণেশের পর বিশ্বকর্মা পুজো। তার একমাসের মধ্যে দুর্গাপুজো। এইভাবে পরপর হয়ে থাকে অন্যান্য পুজো। সমাপ্তি ঘটে সরস্বতী পুজো দিয়ে। এই সময়ে শুরু হয় বাংলার সংস্কৃতি জগতের দীর্ঘ কর্মকাণ্ড, যাকে সোজা কথায় বলা হয় জলসা। কলকাতায় অনেক আগে পাড়ায়-পাড়ায় জলসা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মাঝে অনেকটা সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। বিগত বেশ কয়েক বছরে সেই জলসার যুগ আবার ফিরে এসেছে। বিভিন্ন পুজো কমিটি থেকে তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাতে অংশ নিচ্ছেন মূলত স্থানীয় শিল্পী সহ নামিরাও। জলসা হলে অবধারিতভাবে তার জন্য মঞ্চ, লাইট এবং মিউজিকের ব্যবস্থা প্রয়োজন। এসব অতি পরিচিত ব্যাপার। আমরা দেখতে অভ্যস্ত এই রকম জলসা। এও জানি এর ওপর বহু সঙ্গীতশিল্পী এবং কলাকুশলীদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। কিন্তু বিজেপি সরকার যত্রতত্র জলসার ঘোর বিরোধী। তারা রাস্তা-ঘাটে গানের আসর বসার অনুমতি দিচ্ছে না। বড় জায়গা এবং পুরোপুরি ঘেরা হলে জলসার অনুমতি মিলছে। এখানেই শেষ নয়। জলসাতে শুধু বাংলা গান গাওয়া যাবে। হিন্দি গান নৈব্য-নৈব্য চ। সব মিলিয়ে গভীর সঙ্কটে বাংলার সঙ্গীতশিল্পী ও কলাকুশলীরা।

বিশ্বকর্মা পুজোর সপ্তাহের রবিবার একটি খাওয়া-দাওয়ার আসরে দেখা হয় এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে যিনি ওই সকল অনুষ্ঠানের ঘোষক ও নানা কৌতুক নকশা করে থাকেন। তিনিই সমস্যার কথাটি জানিয়ে বলেন, আমি প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তার সঙ্গে অনুষ্ঠান করে থাকি। বিজেপির নতুন নিয়মে সমস্যা পড়লেও মানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু যাঁরা শুধু অনুষ্ঠান করেই দিন গুজরান করেন তাঁরা চরম বিপদে পড়ে গেলেন। আর শুধু বাংলা গান দিয়ে কি জলসা জমানো যায়? হিন্দি গান ছাড়া অসম্ভব। তার সঙ্গে আড়ালে-আবডালে লাল জল না হলে হয়?

এখন দেখার জেলায়-জেলায় মাচা শোর ক্ষেত্রে সরকার কি নির্দেশ দেয়? ■

কলকাতা পুলিশের যানবাহনের তালিকায় যুক্ত হল আল্ট্রাভায়োলেট এক্স-৪৭ স্কাইফোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কলকাতা পুলিশ তাদের যানবাহনের তালিকায় এক্স-৪৭ ক্রসওভার ইলেকট্রিক মোটর সাইকেল অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষণা করল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে কাজের উপযোগী বিশেষ বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মোটর সাইকেলগুলো পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৮০টি এক্স-৪৭ স্কাইফোর্স মোটর সাইকেল প্রদান করার মাধ্যমে ভারতের যেকোনও পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তম দৃষ্টান্ত। আল্ট্রাভায়োলেট হল প্রথম ইলেকট্রিক দুই চাকার গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা যাদের মোটর সাইকেল কলকাতা পুলিশের যানবাহনের তালিকায় স্থান পেল, যেখানে এক্স-৪৭ স্কাইফোর্স-কে পুলিশি কার্যক্রমে বিশেষভাবে উপযোগী করে একটি বিশেষ টহলদারি গাড়ি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের কাজের ধারা মাথায় রেখে এটি তৈরি করা হয়েছে, যাতে পুলিশের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন — সাইরেন হুটার, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, এলইডি ব্লিকার, মাইক হোল্ডার, ওয়াকিটকি হোল্ডার এবং সাইড প্যানিয়ার (আনুষঙ্গিক বস্তু রাখার বক্স) — সহজে সংযুক্ত করা যায়।



ছবি ঃ **গৌতম কর্মকার**

পরপর সংবর্ধিত ডাঃ প্রকাশ মল্লিক ও ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পরপর কয়েকটি অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক। প্রথমেই বলতে হয় দেশের অন্যতম গৌরবজ্জ্বল মিডিয়া হাউস 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে 'লিডার অফ এক্সিল্যান্সি অফ ইস্ট ২০২৬'। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এই দুই চিকিৎসককে 'এক্সিল্যান্সি হোমিওপ্যাথি' পুরস্কারে ভূষিত করা হল কলকাতার হায়াত রিজেন্সি হোটেলে। এর আগে গত ১২ সেপ্টেম্বর 'এবিপি আনন্দ' আয়োজিত শিলিগুড়িতে 'উত্তরের উত্তরণ' অনুষ্ঠানে ডাঃ প্রকাশ মল্লিককে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর লর্ডস-এর পক্ষ থেকে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরিতে আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠানে 'হোমাই'-এর তরফে ডাঃ প্রকাশ মল্লিক সংবর্ধিত হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডাঃ প্রকাশ মল্লিক ও ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক — ডাক্তার পি মল্লিক হিসেবে পরিচিত। তাঁরা ক্যান্সার, হাঁপানি, যৌন রোগ সহ বহু জটিল রোগ সারিয়ে তুলে নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের ঘিরে একটি স্লোগানের জন্ম হয়েছে 'যে রোগ সারে না কোনও প্যাথিতে, তার জন্য ডাঃ পি মল্লিক আছেন'।



গত ১৫ অক্টোবর ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুলের উদ্যোগে বইমেলা এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই শিবিরে প্রবাদপ্রতিম হোমিও চিকিৎসক ডাক্তার প্রকাশ মল্লিক এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার পার্থ সারথি মল্লিক এবং শ্রীবাস সেন উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মল্লিক তাঁর বক্তব্যে বলেন এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থা নয়। একে অপরের পরিপূরক। এছাড়াও তিনি হোমিওপ্যাথির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে ৪২ জন রোগীকে বিনামূল্যে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির উদ্যোগে হোমিওপ্যাথিক সেমিনার এবং হোমিও চিকিৎসা শিবির করা হয়। যেকোনও স্কুল, কলেজ এবং ক্লাব আগ্রহী হলে ৯৮৩০০২৩৪৮৭ এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ভারতবর্ষের একটি বিরল শিল্প দলিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ প্রবাদপ্রতীম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্ধশতজন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ, প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রী শিল্পী আশিস শূর নির্মিত এবং প্রদর্শিত ৯২টি 'চন্দ্রমুখী ও দেবদাস' শীর্ষক স্থিরচিত্রের প্রদর্শনীতে এক অদেখা সম্পর্কের সাদা-কালো রসায়ন তৈরি হল ২০ সেপ্টেম্বরে একাডেমি ও ফাইন আর্টস'য়ের উত্তর গ্যালারিতে। আজ অবধি ভারতবর্ষে উনিশটি ভাষায় শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ হলেও, স্থিরচিত্র নিয়ে এমন উদ্ভাবনী ভাবনা বিশ্বে সম্ভবত প্রথম। আলোকচিত্রী শিল্পী আশিস শূর মূলত পরিচিত তাঁর 'ল্যান্ডস্কেপ' শিল্পসত্তার জন্য। কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত একটি উপন্যাসকে বেছে নিয়ে স্থিরচিত্রের মাধ্যমেও যে গল্প বলা যায়, তা দেখে বিস্মিত হয়েছেন উদ্বোধনে উপস্থিত চলচ্চিত্র পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী। অন্যতম উদ্বোধক চিত্রশিল্পী সমীর আইচ আশিস শূর'য়ের শৈল্পিক নিদর্শনে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত। সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য 'ভারত গৌরব' সম্মানে ভূষিত সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মী অনির্বাণ চৌধুরী। অনির্বাণ বলেন— ''দূরারোগ্য স্নায়ুর অসুখে অবশ হয়ে যাওয়া দুই পা নিয়ে, একটি মানুষ শুধু শিল্পের তাগিদে ন'বার স্পিতি ভ্যালি আর লাদাখ সহ অর্ধেক পৃথিবী চষে ফেলতে পারে তা শিল্পজগতে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা''। আশিস শূর-এর সহধর্মিণী পম্পা শূর প্রকাশ্যে আনেন 'চন্দ্রমুখী ও দেবদাস' সৃষ্টিপ্রকল্প চলাকালীনই। আশিস বাবু কর্কট রোগে আক্রান্ত। তিনি যে কেবল কেমোথেরাপির ক্রমান্বয় ব্যথাকে জয় করেছেন তাই নয়, তিনি হয়তো জয় করে নিয়েছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয়ও। আশিস শূরের এই 'চলমান লেন্স-গল্পে' চন্দ্রমুখীর প্রেম দর্শন এবং তাঁর রূপান্তকরণকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ৯২ টি স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর ৮০ টি ফ্রেমেই চন্দ্রমুখী একটি আত্মরূপান্তরের যাত্রা। আশিস শূরের পরিচালনায় চন্দ্রমুখীর চরিত্রে মুকাভিনয় করেছেন মডেল ও নৃত্যশিল্পী ঔরবাগ্নি দাশগুপ্ত। তাঁর দৃষ্টিভাষা, মুখের নীরবতা, অনুচ্চারিত স্পর্শ, বাঙ্ময় বেদনা, কাতর অনুরোধ, অনুভূতি; উপন্যাসের অন্তর্লীন আবেগকে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে যে, মনে হবে শরৎবাবু বুঝি ঔরবাগ্নি'কেই চন্দ্রমুখী হিসেবে দেখেছিলেন। দেবদাসের চরিত্রে উদীয়মান অভিনেতা অয়ন ভাদুড়ি এবং চুনীলালের ভূমিকায় মঞ্চাভিনেতা অনির্বাণ চৌধুরী স্ব-স্ব অভিনয় গুণে উদ্ভাসিত। এই চিত্র প্রদর্শনীর মঞ্চেই হরনাথ চক্রবর্তী এবং সমীর আইচের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, আশিস শূরের গ্রন্থনায় অভিনব ৯৪টি আলোকচিত্র সমন্বিত 'চন্দ্রমুখী ও দেবদাস — An Eternal Love Story' পুস্তকটির মোড়ক উন্মোচিত হল। শ্রী শূর জানান— ''১৯৫৫ সালে শ্রদ্ধেয় চিত্রপরিচালক বিমল রায় নির্দেশিত হিন্দি ছবি 'দেবদাস'য়ের প্রভাব ভীষণভাবে উপস্থিত এই প্রদর্শনী এবং বইতে, যেখানে চন্দ্রমুখী, দেবদাস এবং চুনীলালের সংলাপ তিনি প্রায় অনুবাদ করেছেন, বিমল রায় নির্মিত হিন্দি সংলাপের সূত্র ধরে''। 'চন্দ্রমুখী ও দেবদাস' কেবলমাত্র একটি উপন্যাসকেন্দ্রিক স্থিরচিত্র প্রদর্শনীই নয়, এটি ভারতবর্ষের একটি বিরল শিল্পদলিল।



আইএসএলের বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম করতে পারেনি

রবীন্দ্রনাথ চৌধুরি

দেশে জাতীয় লিগ শুরু হবার পর ভারতীয় ফুটবলের ব্যপ্তি বেড়েছিল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের সঙ্গে জেসিটি, ডেম্পো, সালগাঁওকর, কেরল পুলিশ, আইটিআই দলগুলির পাশে উঠে এসেছিল এফসি কোচিন, বেঙ্গল মুম্বাই ফুটবল ক্লাব। ২০১৪ সালে ফ্রাঞ্চাইজি লিগ শুরু হওয়ার সময় আমরা দেখেছিলাম মুম্বাই সিটি এফসি, এফসি গোয়া, বেঙ্গালুরু এসসি, চেন্নাইয়ান এফসির মতো দলগুলিকে, যারা প্রায় ১০ মাস ফুটবল টিম চালানোর মানসিকতা দেখাত। কিন্তু গত দু'বছর ধরে সেই উৎসাহে ভাটা। সাত, আট, কিংবা নয়ের দশকে তবু জেসিটি, ডেম্পো, সালগাঁওকার, কেরল পুলিশ সারা বছর ধরে ফুটবল টিম চালাত। কিন্তু গত দু'বছর রিলায়েন্সের সহযোগী সংস্থা এফএসডিএল-এর সঙ্গে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন-এর ঝামেলার জন্য এফসি গোয়া, মুম্বাই সিটি এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি ফুটবলে আর লগ্নি করতে চাইছে না। গত মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ এক পর্বের হওয়ার জন্য মুম্বাই সিটি এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি বিদেশিদের কোটা পূর্ণ করেনি। অর্থ বাঁচাতে তারা বিদেশিদের রিলিজ করে দিয়েছিল। এফএসডিএল-এর সঙ্গে এআইএফএফ-এর ঝামেলার মূলে ছিলেন ফুটবল হাউসের শীর্ষ কর্তা। ব্যক্তিগত ইগোর জন্য এফএসডিএল-এর সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে সময় মতো কোনও আলোচনাই হয়নি। তার জেরেই এফএসডিএল সরে গেছে ভারতীয় ফুটবল থেকে। রিলায়েন্সের একটি কোম্পানি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ স্পনসর করছে। এই মুহূর্তে ফুটবলের সঙ্গে রিলায়েন্সের যোগাযোগ ওইটুকুই। তবে তারা অনূর্ধ্ব ২১-দের নিয়ে একটি যুব লিগের আয়োজন এবারও করছে। মুম্বাইয়ে রিলায়েন্সের একাডেমিতে লগ্নি অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যারেটো তাই রিলায়েন্স একাডেমি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন।



এসএসডিএল কিংবা রিলায়েন্স গ্রুপ নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার ফলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে পাঁচ-ছটি ক্লাব ফুটবলে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। মুম্বাই সিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সিটি গ্রুপ। চেন্নাইয়ান এফসি নিয়ে আগ্রহ হারিয়েছেন রিলায়েন্স কর্ত্রী নীতা আম্বানি। এফসি গোয়া দলে দু-তিন বছর ধরেই সমস্যা চলছিল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তারা প্রথম চার-পাঁচ বছর খুবই শক্তিশালী দল গড়েছে। সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু লাভের মুখ দেখতে না পারায় দল মালিকরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন।ইন্ডিয়ান সুপার লিগ করতে প্রচুর খরচ।ম্যাচ সংগঠনে এত ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, খরচ কমানোর উপায় নেই। কোনও দলেরই নিজস্ব স্টেডিয়াম নেই। প্রতিটি রাজ্য সরকারি সংস্থা তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। কারণ খাতায়-কলমে এটি বেসরকারি লিগ যতই এআইএফএফ অনুমোদিত হোক না কেন। ফলে উল্লেখিত চার-পাঁচটি দল খেলছে বটে, কিন্তু তারা মরশুমটাকে অর্ধেক করে দিয়েছে। এর ফলে বাজেট কমে গিয়েছে। এই উল্লেখিত দলগুলি গত বছর ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হতে টালবাহানা চলায় অনেক ফুটবলারদের মাহিনা অর্ধেক করে দিয়েছে। এর মধ্যে সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ, গুরপ্রীতরাও আছেন। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা কেরল ব্লাস্টার্সের। একটা সময় শচীন তেন্ডুলকার ছিলেন ওই দলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তারা সফলও হয়েছিল। এই ক্লাবগুলি যখন বড় বাজেটের টিম করত, তখন মোহনবাগান ছাড়া কেউ এদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেনি। ভিন্ রাজ্যের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি উৎসাহ হারানোর ফলে ভারতীয় ফুটবল দুনিয়া আরও ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে।

মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলকে গোটা মরশুমের জন্য টিম করতে হবে। এটা সমর্থকদের দাবি। কলকাতা লিগের ব্যাপারটিও তাদের মাথায় রাখতে হয়। কিন্তু অন্য ফ্রাঞ্চাইজিগুলির সেই মাথাব্যথা নেই। তাহলে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড-এর কেন এত উৎসাহ? তাদের দল মালিকের জন্য। আর ভারতীয় ফুটবলটা এখন নর্থ-ইস্ট ওরিয়েন্টেড। নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড তাই গুয়াহাটির পাশাপাশি শিলং-এও খেলে তাদের হোম ম্যাচ। নর্থ-ইস্ট পাঁচ-ছটি রাজ্যের প্রতিনিধি। তাদের স্পনসর পেতে তাই একটু বেশি সুবিধা হয়েছে। রাউন্ড গ্লাস পাঞ্জাব এফসি অধিগ্রহণ করার পর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চলছে। পাঞ্জাব এফসি এই মুহূর্তে যুব উন্নয়নে একনম্বর দল। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন।

দেশের বেশ কিছু অগ্রণী ক্লাব বাজেট কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ঠিক-ঠিক বিচারে ভারতীয় ফুটবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গত দু'বছরে কমে গিয়েছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে কার্যত পাঞ্জাব এফসি কিংবা নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে। নিজেদের গরীমা এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল লগ্নি করছে। যদিও দুই ক্লাবের স্ট্র্যাটেজি ভিন্ন। মোহনবাগান পুরো ব্যাপারটাই ছেড়ে দিয়েছে তাদের লগ্নিকারী সংস্থার মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ওপর। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হাতে এখনও ফুটবল টিমের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। দেবব্রত সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন অর্থ জোগাড়ের। ইমামি চলে যাওয়ার পর গত চার মাসে দলকে যে জায়গায় রেখেছেন তাঁকে সফল বলতেই হবে।

ইস্টবেঙ্গল ফুটবল টিম এবং মহিলা দল চালাতে মোট খরচ ৬.৫ কোটি প্রতি মাসে। অক্টোবর পর্যন্ত তিনি চালিয়ে দিলেন। ফুটবল মরসুমের দ্বিতীয় অর্ধে বড় লগ্নীকারী সংস্থা না পেলে ইস্টবেঙ্গল সমস্যায় পড়বে। এর জন্য দেবব্রত সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। এমনকী কোয়েস-এর কাছ থেকে পাওনা অর্থ জোগাড় করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করেছেন। চেষ্টা করছেন ইডির ফ্রিজ করে দেওয়া অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ পুনরুদ্ধারে। ওই অর্থ ইস্টবেঙ্গল ফেরত পাবে কিনা সেটা নির্ভর করছে ট্রাইবুনালের ওপর। ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্মকর্তা এই ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছেন কর্ম সমিতির সদস্য সদানন্দ মুখার্জিকে। হঠাৎ দেশের ফুটবল দুনিয়া ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়াতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যেই সর্বভারতীয় ট্রফিগুলি ঘোরাফেরা করছে। ভারতবর্ষের ফুটবল দুনিয়া ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে স্পনসরের অভাবে।

ফুটবলে টাকা নেই। ইন্ডিয়া-ব্রাজিল ম্যাচ সংগঠন করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে। ব্রাজিলকে এনেও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন স্পনসরশিপ থেকে কুড়ি কোটির বেশি আনতে পারিনি বলেই আপাতত সূত্রের খবর। এদের মধ্যে আবার কিছু ছিল সরকারি সংস্থা। যেমন কোল ইন্ডিয়া কিংবা ইন্ডিয়ান অয়েল। ডুরান্ড কাপের স্পনসরের দিকে তাকান, ইন্ডিয়ান অয়েলকেই দেখতে পাবেন। আইএফএ শিল্ডে কোনও স্পনসর ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা একটাই ফ্যান কোড অ্যাপে খেলা সরাসরি দেখা গিয়েছে। কলকাতা লিগের তুলনায় আইএফএ শিল্ড বেশি সংখ্যায় মানুষ দেখেছেন। মাঠের ভেতরে বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে লিগে স্পনসর একটি বস্ত্র বিপণিকে। পুজো সামনে ছিল বলেই তারা এগিয়ে এসেছিল। পুজোর পর শিল্ড হলে তারা হয়তো উৎসাহ দেখাত না। ■

আইএফএ শিল্ডে কেলেঙ্কারি !

জয় চৌধুরি

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত পুজোর আগে কলকাতা লিগ এবং শিল্ড নামিয়ে (উনি এই শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করেন বলে লিখলাম) দিতে পেরে তৃপ্ত হতেই পারেন। ঘটনা হল, বিশ্বনাথ দত্ত, অশোক ঘোষ, অশোক মিত্র এমনকি রঞ্জিত গুপ্ত, মন্টু ঘোষের আমলেও পুজোর আগে কলকাতা লিগ এবং শিল্ড শেষ হয়েছে। সুব্রত দত্তের আমলে কয়েকবার। কিন্তু উৎপল গাঙ্গুলির সময় থেকে সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। এর একটা বড় কারণ ছিল আগে কলকাতা লিগ শুরু হতো রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময়। নতুন বছরের প্র্যাকটিস শুরু হতো ১লা বৈশাখ এখন হয় পয়লা জুলাই। ফিফা উইন্ডো মেনেই সব হয়। এবছর পুজো দেরিতে হওয়ায় একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন অনির্বাণ দত্ত। সেটা তিনি কাজে লাগিয়েছেন। আইএফএ নির্বাচনও আছে সামনে। অনির্বাণ দত্ত এখন আছেন এক্সটেন্ডেড পিরিয়ডে। মোট পাঁচটি আইএফএ শিল্ড করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। করেছেন মাত্র দুটি। তাও আবার ছ'দলের। বাবা-কাকারা যখন আইএফএ চালিয়েছেন, পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব, আরারাতের মতো টিম এসেছিল। প্রদ্যুৎ দত্ত আর্জেন্টিনার পেনারাল পাভলাদার উন্নত রাশিয়ান টিমকে এনেছিলেন।



আইএফ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

এবারের আইএফএ শিল্ডে গোলের বন্যা। ৬-০, ৭-০, ৭-২ রেজাল্ট হল। ইস্টবেঙ্গল মাঠে এসে পাঞ্জাব এফসি তাদের হারিয়ে দিল। ময়দানে প্রথম খেলল নর্থ-ইস্ট, পাঞ্জাব এফসি-র মতো ইন্ডিয়ান সুপার লিগের টিম। কিন্তু সেমিফাইনালের সূচি যেভাবে করা হল সেটা একটা কেলেঙ্কারি। আইএফএ শিল্ডের কোনও সরকারি প্রেস কনফারেন্স হয়নি। কিন্তু আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত যখন বলেছিলেন আমরা ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে শিল্ড করার জন্য অনুমতি চাইছি, তখনই জানিয়েছিলেন ছয় দলের প্রতিযোগিতা হবে। এবং সবাই জানতেন সেমিফাইনাল হবে ক্রস ওয়াইজ। কিন্তু যখন ইস্টবেঙ্গল পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে হেরে গেল তখনই মোহনবাগান সূত্রে জানতে পারলাম সেমিফাইনালে দুই প্রধান মুখোমুখি হবে না। আইএফএ নাকি শিল্ডের মোডালিটিতে এমন একটি ক্লজ রেখেছে যেখানে সেমিফাইনালের সূচি তৈরি করার আগে লটারি হতে পারে। সেদিন (মোহনবাগান নর্থ-ইস্ট ম্যাচ শেষ হবার পর) মোহনবাগানের সূত্রটি জানিয়েছিল আমরা সেমিফাইনালে সন্তোষপুর স্টেডিয়ামে ৪ অক্টোবর খেলব পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। পরদিন ওরা খেলবে আমাদের গ্রুপে থাকা নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে। এতো প্রহসন।

ডিজিটাল মিডিয়ার একটা সুযোগ রয়েছে, খবর পেলেই আপলোড করে দেওয়া যায়। সেটা শুনে সেদিন রাতে এক অনুজ সাংবাদিক ফোন করে বলল জয়দা তোমার মতো সিনিয়র সাংবাদিক এইসব কি বলছ? এ সব হতে পারে নাকি? ওই সাংবাদিক হয়তো আমার ভালোর জন্যই বলেছিল। আমি ওকে বললাম, ভাই আমি রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত মোহনবাগান তাঁবুতে ছিলাম। খবরটি প্রথম পাই মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের লোকজনদের কাছ থেকে, যাতে সিলমোহর দিয়েছেন মোহনবাগান এসজির কর্মকর্তা। শেষ পর্যন্ত সেটাই হল! এইরকম প্রহসন আমরা আগে দেখিনি।

যেভাবেই হোক শিল্ড সম্পূর্ণ করতে হবে। এর জন্য আইএফএ কর্মকর্তারা রাত জাগলেন। সঙ্গে কর্মীরা। সামনে নির্বাচন। নির্বাচনে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট একটা বড় ফ্যাক্টর। অনির্বাণ দত্ত এবং তাঁর টিম কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের বন্টন করে গভীর রাতে অফিস ছেড়েছেন। আবার বৃহস্পতিবার চলে এসেছেন বেলা ১১ঃ৩০-এ। কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ক্লাবগুলি হাতে পেয়েছে দুপুরবেলায়। তবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল পাঁচ হাজার করে এই টিকিট পেয়েছে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটায়। টিকিট স্টাম্পিং করতে আইএফএকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে ইন্দ্রনীল খাঁ-এর ডিপার্টমেন্ট। সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের জন্য টিকিট ছিল অ্যাপে পেপার লেস। পুজোর মুখে স্টেডিয়াম সেই জন্য ভরেনি। তবুও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে মন্দ হয়নি ভিড়।

কিন্তু টুর্নামেন্ট সম্পূর্ণ করলেই তো হয় না। বাইচুং ভুটিয়া ইদানিং একটি কথা প্রায় বলছেন, টুর্নামেন্ট সম্পূর্ণ করাটা বড় কথা নয়, কীভাবে হচ্ছে সেটা দেখা উচিত? বাইচুং অনেক সময় নিজের স্বার্থে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তাঁর এই কথাটা ১০০ শতাংশ ঠিক। কলকাতা লিগের খেতাব নির্ধারক ম্যাচে রেফারিং নিয়ে এতো বিতর্ক হল, তবুও আইএফএ শিল্ডে সেই রেফারি ফাইনাল ম্যাচ খেলানোর দায়িত্ব পেলেন। ছেলেটি যথেষ্ট স্মার্ট। ইচ্ছাকৃতভাবেই রেফারির নামটা লিখলাম না। অদ্যাক্ষরে এস আছে। আমি যদি এই খবর পেতে পারি তবে ডিডি মাস্টার, কিংবা ক্যাপ্টেনদের মতো লোকজনের কাছে এই সংবাদ তো অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে। এদের কেউ-কেউ নিজেদের ময়দানের বেতাজ বাদশা মনে করেন। কেউ নিজেকে ক্লাবের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভাবেন।

ডুরান্ড কাপের পর আইএফএ শিল্ড কলকাতাতেই থাকল। পুজোর আগে দু-দুটি সর্বভারতীয় টুর্নামেন্ট কলকাতায় এসে যাওয়ায় বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীরা ভাবতেই পারেন ফুটবলের সেই গৌরব ফিরে এসেছে। কারণ গত মরশুমে দেশের সেরা লিগে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। সেটা যতই এক পর্বের লিগ হোক না কেন। তার আগের মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান এসজি। যদিও ২০২৫-২৬ মরশুমে ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নর্থ ইস্ট-ইউনাইটেড। ২০২৪-২৫ মরশুমে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান এবং নর্থইস্ট। সেই ফাইনালে টাইব্রেকারে জিতেছিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। গত চার বছরে মোহনবাগান এসজির সাতটি ম্যাচ টাইব্রেকারে গিয়েছে। তার মধ্যে ছ'টিতেই মোহনবাগানকে জিতিয়েছেন বিশাল কেইথ। ওই একটি ম্যাচেই তিনি দলকে জেতাতে পারেননি। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে কলকাতার ঐতিহ্যশালী দুই প্রধান। এই পরিসংখ্যান কি প্রমাণ করে? ■

কলকাতা ময়দানে একটি বৃহত্তর ‘সমঝোতার খেলা’ হতে চলেছে!

জয় চৌধুরি

এই মুহূর্তে আইএফএ-র দৈনন্দিন কাজে সুব্রত দত্ত একেবারেই জড়িত নন। যদিও আসন্ন নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা ‘মেঘনাদের’ মতো হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের চাপ রাখতে না পেরে অডিটেড অ্যাকাউন্টস পেশ করার আগেই ইস্তফা দিলেন অজিত ব্যানার্জি। নির্দিষ্ট দিনে লিগ শেষ করেছেন অনির্বাণ দত্ত। আইএফএ শিল্ডও পুজোর আগে শেষ হয়েছে। হারকিউলিসের মতো আইএফএকে একাই টানছেন অনির্বাণ। পরিচিত এক সাংবাদিকের পোস্টে সেই ধারণা আরও দৃঢ় হচ্ছে। যদিও ৪০ মাসে প্রশাসক হিসেবে তিনি কিন্তু অনেক ‘অক্ষয় অপকীর্তি’ গড়েছেন।

১. ২০২১-এর ডিসেম্বরে এক অভিজাত ক্লাবে জয়দীপ মুখার্জির সঙ্গে সুব্রত দত্তর মিটিং। রবিন ঘোষ কোষাধ্যক্ষ পদে দাঁড়াবেন জেনেও সুব্রতবাবু অনুরোধ করেন ভোটাভুটি না করে অনির্বাণকে মেনে নিতে। জয়দীপ গুরুর কথা ফেলেননি। পরে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল টিমের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে অজিত ব্যানার্জির সঙ্গে বিরোধে এক পুরনো কর্মী বলির পাঁঠা হতে যাচ্ছিলেন, রুখে দাঁড়ান জয়দীপ। টার্মের এক বছর আগেই ইস্তফা দেন তিনি। কোষাধ্যক্ষ থেকে সচিব হন অনির্বাণ, সুব্রত দত্তর স্টাইলে।



কল্যাণ চৌবে।



সুব্রত দত্ত।



অনির্বাণ দত্ত।

২. সচিব হিসেবে অনির্বাণ ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ - তিন মরসুমে আইএফএ শিল্ড করতেই পারেননি। ২০২৫-২৬-এ ছয় দলের শিল্ড হয়, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফাইনাল যুবভারতীতে। ৪০ মাসে একটিই সফল বড় ম্যাচ। চার বছরে অন্তত ৬/৭টি বড় ম্যাচ হওয়ার কথা। এবারের শিল্ড তার এক্সটেন্ডেড পিরিয়ডের।

৩. তাঁর ৪০ মাসে লিগ ও শিল্ডের বড় ম্যাচের গুরুত্ব কমেছে। ২০২৩-এ সুপার সিক্সে ডার্বির আগেই মহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল — নজিরবিহীন। সেই ডার্বি নিয়ে গেলেন নৈহাটিতে। বিনা পয়সায় খেলা দেখা যাবে ঘোষণা হল। সেখান থেকেই সনদ দে-র উত্থান। তৎকালীন সচিব দেবাশিস দত্ত ওটা নাইমের বেনিফিট ম্যাচ করতে বলেছিলেন। বিনয় চোপড়া জাতীয় ক্যাম্পের জন্য ম্যাচটি পিছোতে বলেছিলেন। লেসলি ক্লডিয়াস সরণির একটি ক্লাবের চাপে নৈহাটি ডার্বিতে ওয়াকওভার দিল মোহনবাগান।

৪. ২০২৩-এর ২৯ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল-ভবানীপুর ম্যাচ। লিগ দৌড়ে মোহনবাগানের চেয়ে ভাল জায়গায় ছিল ভবানীপুর। ৩১ আগস্ট তাদের প্লেয়ার রিলিজ হয়ে যাবে জেনেও লাল-হলুদ স্বার্থে ম্যাচটি বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

৫. তাঁর আমলে কলকাতা লিগ গট-আপ থেকে অর্গানাইজড বেটিংয়ে পরিণত হয়েছে। উৎপল গাঙ্গুলির আমলে সুরজ মণ্ডলের ঘটনা ছিল বিচ্ছিন্ন। ২০২৩-এর ২ সেপ্টেম্বর শৈলেন মান্না স্মরণে প্রথম মুখ খোলেন সৃঞ্জয় বসু। গত ১ ডিসেম্বর তিন কর্তা ও চার ফুটবলার ধরা পড়েন, এখন জামিনে। চ্যাম্পিয়নশিপ ও অবনমনের নিয়মও অদ্ভুত — লিগ শুরুর আগেই দুটি দল না খেলায় নেমে গিয়েছিল।

৬. ২০২৩-২৪-এ স্পনসর হিসেবে আয়ারল্যান্ডের ইন-স্পোর্টসকে আনা হয়। ভাল উদ্যোগ, কিন্তু তারা পুরো অর্থ দেয়নি। চুক্তি বৈদেশিক মুদ্রা আইন মেনে হয়েছিল কি? ফাইনান্স কমিটির সদস্যরাও পুরোটা জানতেন না।

৭. ২০২৩-এ এআইএফএফ-এর অ্যাকাডেমি ফুটবলের নির্দেশিকা আইএফএ-র রেজিস্টার্ড অ্যাকাডেমিগুলোতে পাঠাতে ভুলে যায়। সেই ভুলে সাব-জুনিয়াররা সর্বভারতীয় সার্কিটে খেলতে পারেনি।

৮. অনির্বাণ দত্তের আমলে স্টেট ইউথ লিগ থেকে নাম তুলে নিয়েছে আইএফএ-র নিজস্ব অ্যাকাডেমি।

৯. গত তিন আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ৮৫ লাখ টাকা দিয়েছে, আইএফএ-র দ্বিতীয় বৃহত্তম পৃষ্ঠপোষক। শুধু একটি বছরে শ্রাচী স্পোর্টস রাজ্যের থেকেও বেশি দিয়েছিল।

১০. তিনিই একমাত্র সচিব যাঁর আমলে কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট সৌরভ পাল ইস্তফা দিয়েছেন, শেষে অজিত ব্যানার্জিও। এক টার্মে দুই শীর্ষ কর্তার ইস্তফা আগে হয়নি।

১১. গভর্নিং বডির সদস্য সনৎ দে ও ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বরূপ বিশ্বাস টার্ম শেষের আগেই গ্রেপ্তার হলেন। মিটিং ডেকে সরানো হল না?

১২. শেষ ৪/৫ মাস আইএফএ-তে একনায়কতন্ত্র চলছে। ২৩ মে গভর্নিং বডিতে রেজাল্ট টেম্পারিং নিয়ে উত্তাল সভার পর সচিব অনির্বাণ দত্ত আর মিটিং ডাকছেন না। এআইএফএফ-এ কল্যাণ চৌবের কমিটি তবু এজিএম ডেকেছে।

১৩. সদ্য সমাপ্ত লিগে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ যখন হল, তিনটি দল আগেই সুপার সিক্সে চলে গিয়েছে, ম্যাচের গুরুত্ব থাকল না। ভেন্যু বারাসাত, পুলিশের অনুমতি ৯৮০০ দর্শকের। গত বছর কল্যাণীতে ১২ হাজারি ডার্বি, এবার ১০ হাজারি। বড় ম্যাচের গুরুত্ব বাড়াতে দুই বিদেশি চালু করা উচিত বলে দাবি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে সুবিধা দিতে প্রিমিয়ারে এ ও বি এক করে দেওয়ার কথাও মনে পড়ে।

১৪. গতবার নৈহাটিতে লিগের জাঁকজমক উদ্বোধন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা কত বিল করেছিল? দেবাশিস সরকার কেন ১৪ মাস আগে ‘শিরদাঁড়া

বিক্রি করিনি' লেখা গেঞ্জি পরে ইস্তফা দিলেন? ইনকাম ট্যাক্স অনেক কমিয়েছিলেন তিনি।

১৫. ফিনান্স কমিটিতে শ্রাচীর হয়ে এত ব্যাটিং করলেন, তারা শেষ পর্যন্ত আইএফএ-কে ডোবাল কেন? অজিতবাবু শেষ দিকে বলেছেন, রাহুল টোডি, তমাল মুখার্জিদের কাছে আইএফএ-র তিন কোটি টাকা পাওনা। সংস্থাটি যে 'স্লিপারি', জানতেন না? ইস্টবেঙ্গলের ক্রিকেট টিম মাঝপথে ছেড়েছিল, মহামেডানকে ডুবিয়েছে। ফিনান্স কমিটির মিটিংয়ে তিনি নিজে গ্যারান্টার ছিলেন। তাহলে তাঁকেই অর্থ দিতে হয়। উৎপল গাঙ্গুলির সময় নিজের কোম্পানির টাকা আইএফএ-তে ট্রান্সফার করেছিলেন, বিদায়বেলায় কিছু নিয়েও গিয়েছেন। সেই নজির আছে।

১৬. ইস্টবেঙ্গলকে সুবিধা দিতে মহামেডানের পয়েন্ট কাটা ও রোল ব্যাক। ২০২৪-এ পঞ্চমীর দিন আইএফএ সচিবের ঘরে ক্যামেরার সামনে অনির্বাণ ও অজিত বললেন, মহামেডান ভূমিপুত্র নিয়ম মানেনি বলে তিন পয়েন্ট লাল-হলুদকে দেওয়া হল। লদীপুজোর দিন অফিস খুলে অজিত বললেন, চিঠি দিইনি। মাঝে শ্রাচী (তখন মহামেডানে) হুমকি-চিঠি দিয়েছিল। পরে গভর্নিং বডিতে পয়েন্ট রোল ব্যাক হয়। এই পয়েন্ট দেওয়ার অধিকার ছিল লিগ সাব-কমিটির, শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির নয়। ভুলটা শুধরে দিয়েছিলেন সুব্রত দত্ত। এর জেরে ডায়মন্ডহারবার মামলা করে। ফলে ২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করেই ২০২৫-এর লিগ শুরু করে দিলেন অনির্বাণ-অজিত। বিজেপির প্রথম ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সল্টলেকে বলেছিলেন, আইএফএ-র অনিয়ম নিয়ে আলাদা সাংবাদিক সম্মেলন করব। পরে আরএসএস-বিজেপি টানাপোড়েনে তাঁকে দপ্তর ছাড়তে হয়। বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ সব জানেন, কিন্তু ময়দান কতটা পিচ্ছিল বুঝতে পারছেন না। তিনি মেডিকেল কলেজ থেকে ময়দানে এসেছেন। ডায়মন্ড সিস্টেম না বক্স সিস্টেম, কোনও স্ট্র্যাটেজিতে খেলবেন, সেটাই এখন দেখার।

শোনা যাচ্ছে, এত অক্ষয় কীর্তি করার পরও আইএফএস সচিব পদে টিকে যাচ্ছেন অনির্বাণ দত্ত। বিনিময়ে জর্জ টেলিগ্রাফ গোষ্ঠী কল্যাণ চৌবেকে এআইএফএফ সভাপতি হিসেবে মেনে নিচ্ছে। কল্যাণ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হবার পর সাড়ে তিন বছরের সাড়ে তিন দিন ময়দান করেননি। শেষ ছয় মাস তিনি ময়দান করেছেন অনির্বাণ দত্ত গোষ্ঠীর বিরোধীদের সঙ্গে। তবে ব্রাজিল-ইন্ডিয়া এবং ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি অনির্বাণ দত্তকে কিছুটা স্পেস দিয়েছেন। আইএফএ নির্বাচনে মেঘনাদ সুব্রত দত্তের খেলা ছিল এটাই। কল্যাণ চৌবের বক্তব্য, সৌরভ গাঙ্গুলি যদি বিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট হবার পর আবার সিএবি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, (জগমোহন ডালমিয়াও এমন করেছিলেন), তাহলে আমি কেন এআইএফএফ সভাপতি থেকে আইএফএ সভাপতি হতে পারব না?

সাড়ে তিন বছরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে কল্যাণ চৌবেকে ময়দানে ঢুকতে দেননি অরূপ বিশ্বাস। আপাতত তিনি ফসিল হয়ে গিয়েছেন। এর আগে দত্ত পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে এক টাকার সচিব ছিলেন প্রদ্যুৎ দত্ত। তিনি ১৯৮৫-র এপ্রিল থেকে ৮৯ পর্যন্ত প্রথম দফায় সচিব হন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি ছিলেন দ্বিতীয় দফায় অবৈতনিক সচিব। তখন আইএফএ-এর সংবিধানে টানা তৃতীয়বার অবৈতনিক সচিব থাকার আইন ছিল না। ৯৩ সালের এপ্রিল থেকে আমৃত্যু (১৬ নভেম্বর ১৯৯৪) তিনি এক টাকায় সচিব হয়েছিলেন। অনির্বাণ দত্ত সেটাই হতে চলেছেন। কালিদা এটাই ময়দান। কল্যাণ চৌবে পাঞ্জাব টেন্টের বিরোধীদের ব্যবহার করে সভাপতি হতে যাচ্ছেন। বিনিময়ে তাঁর অতি প্রিয় কর্তা তালতলা একতার খোকাদাকে আশুতোষ কলেজ টেন্টের পাশে নিজস্ব তাঁবু করে দিচ্ছেন সঙ্গে একটি মাঠ। ■

আইএফএ-তে জাতীয় ক্রীড়ানীতি লাগু ঘোষিত নির্বাচনের দিন

জয় চৌধুরি

আগামী ১৪ নভেম্বর আইএফএ-তে নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয়েছে। সুবর্ণবণিক সমাজ হল্-এ আইএফএ-র বিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের দিনের কথা জানানো হয়েছে। এদিনের সভায় নতুন সংবিধান গৃহীত হল আইএফএ-তে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী গঠন করা হবে নতুন কমিটি। এই কমিটিতে ১৫ জন সদস্য থাকবেন। বেতনভুক সচিব হবেন রাজ্য ফুটবল সংস্থায়। তবে সংস্থা পরিচালনা করবেন সভাপতি। ১৫ জন সদস্যের কমিটিতে তিনজন সহ-সভাপতি থাকবেন। তার মধ্যে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। ২৮ অক্টোবর ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করার কথা। যদি আপত্তি থাকে, তা জানাতে হবে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে। ৩১ অক্টোবর থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩ নভেম্বর। ৭ নভেম্বর মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি হবে। ৯ নভেম্বর বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। ১১ নভেম্বর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ সহ অন্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটিতে আসতে হবে। ১৫ সদস্যের কমিটিতে চারজন মহিলার পাশে জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত হবেন। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত।

তিনি বলেন, আমরা যারা আইএফএকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, তাদের লক্ষ্য একটাই — বাংলার ফুটবলের ভাল করা। আর সেটাই যদি আমাদের কমন লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে আগামী দিনে সবাই এক হয়ে কাজ করুক — নির্বাচনের প্রাক্কালে এটাই আমার বার্তা। গ্রুপিজম করে বড় কাজ কখনই করা যায় না। আমি চিরকাল সকলকে নিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী। পদে না থাকলেও ফুটবলের সঙ্গেই তো থাকব। কাজের ধরন বা স্টাইল প্রশাসক হিসেবে ভিন্ন-ভিন্ন। কেউ নমনীয়। কেউ হয়তো অতটা উদার নয়। কিন্তু বাংলার ফুটবল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, একসঙ্গে চলার এটাই আদর্শ সময়। মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে সব কিছুই মিটিয়ে নেওয়া যায়। বিশেষ করে ফুটবলের স্বার্থে। নতুন সংবিধানে পদাধিকারী মাত্র ১৫ জন। এর মধ্যে চারজন মহিলা থাকবেন। তার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার। দু'জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেন্স (পুরুষ) ফুটবলারও থাকবেন, যাঁদের কুলিং অফ-এ যেতে হচ্ছে, তাঁরা বিভিন্ন সাব কমিটিতে থাকতেই পারেন। আইনগত কোনও অসুবিধা নেই। যেমন স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ে একাধিক এজেন্ডা থাকতে পারে। ইমার্জেন্সি মিটিং হলে একটিমাত্র এজেন্ডা থাকে। ইমার্জেন্সি একটি ক্ষেত্রেই হয়। এই স্পেশাল জেনারেল মিটিং নিয়ে কোনও আইনি জটিলতা নেই। যাঁরা এটা সৃষ্টি করতে চাইছেন, তাঁরা পুরো নিয়ম সঠিকভাবে জানেন না। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের শেষ দিন শনিবার। দুর্গাপুজোর ভাসান শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আইএফ কে ঘিরে যাবতীয় মনোমালিন্য - মতপার্থক্যের বিসর্জন হোক - লক্ষ্মী পুজোর প্রাক্কালে এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। সকলে এক হয় চললেই তো লদী লাভ হবে বাংলার ফুটবলের।

পুজোর প্রেক্ষাপটে সুব্রত দত্ত যেভাবে সমঝোতার জন্য সওয়াল করেছেন সেটা লক্ষণীয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো ইলেকশন হবে না। সমঝোতার ভিত্তিতেই তৈরি হবে কমিটি। এই কমিটিতে থাকছেন জর্জ টেলিগ্রাফ গোষ্ঠীর লোকজনদের সঙ্গে তাঁর বিরোধীরা। এবং ক্রীড়াভারতী, আরএসএসের স্পোর্টস সংগঠন কয়েকজন প্রাক্তন মহিলা পর্যায়ের খেলোয়ারকে ঢোকাতে চাইছেন। নাম আছে কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার এবং অনিতা সরকারের। ■

Laze

CLOTHES FOR
COMFORTABLE DAYS

BUY 2 GET 1 FREE

Comfort shouldn't be complicated.

Everyday tees,
made for
every kind of day.



DUNE



CANVAS



MIST



MIDNIGHT

SOFT
COTTON FEEL

BREATHABLE
ALL DAY

JUST ENOUGH
STRETCH

MADE
TO LAST

www.laze.co.in | 9831122222

SIMPLE CHOICES.
BETTER PIECES.

Laze

Everyday T-Shirts

SOFT | BREATHABLE | TIMELESS



BUY 2 GET 1 FREE

MADE FROM COTTON | SOFT & BREATHABLE | EVERYDAY COMFORT

www.laze.co.in | 9831122222

Laze

COMFORT SHOULDN'T BE COMPLICATED.



WHITE | NAVY | MAROON | BLACK

PANDA TEE

SAME COMFORT. DIFFERENT MOODS.

DOUBLE MERCERISED COTTON
Smoother, softer and more refined.

STRETCHABLE
Moves with you, all day.

BREATHABLE
Light and easy on the skin.

KEEPS ITS SHAPE
Wear after wear.



DOUBLE MERCERISED COTTON



MINIMAL EMBROIDERY



JUST THE RIGHT STRETCH

BUY 2 GET 1 FREE

WWW.LAZE.CO.IN | 9831122222

RNI No. : WBBEN/2004/14163
Postal Registration No. : KOLRMS/400/2019-2021

www.kutchina.com

KUTCHINA®
THE KITCHEN EXPERTS

Kolkata's first
Kitchen Stylist.
Now in Topsia.

THE SIGNATURE STUDIO



OUR LARGEST KITCHEN STUDIO IS THE ONE-STOP SHOP FOR ALL YOUR KITCHEN NEEDS.



Why choose KUTCHINA®?

1 | State-of-the-art manufacturing facility with latest technology

2 | 10 years warranty for worry free cooking

3 | More than 10 lakh happy customers

4 | Complete kitchen solutions under one brand

5 | Fast and expert service from our trained technicians

customercare@kutchina.com | Sales and Service Enquiry: 1800 4197 333 | Follow us: kutchinaconnect